স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২৮ মে - ২০১২।। ১৪ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৯।। দাম : সাত টাকা

পাকিস্তানে

হিন্দু নির্যাতন

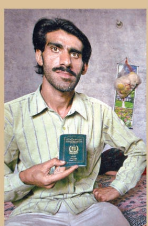

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮
আসন্ন নির্বাচনগুলিই তৃণমূল সরকারের ‘অ্যাসিড টেস্ট’ □ ৯
সরকারের বর্ষপূর্তিতেও অধরা ‘পরিবর্তন’ □ ১০
মুসলিম তোষণে বাম থেকে তৃণমূল : কোনও ‘পরিবর্তন’ নেই, আছে ‘পরিবর্ধন’ □ ভাস্কর ভট্টাচার্য □ ১১
সংসদে অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক উষ্মা কিসের ইঙ্গিত? □ এন সি দে □ ১২
পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই □ অবিনাশ রাই খান্না □ ১৪
পাকিস্তানী হিন্দুদের দুর্দশা, পলায়ন অব্যাহত □ বাসুদেব পাল □ ১৫
এপার-ওপার, কোনও পারেই মানবিক ব্যবহার পাচ্ছেন না হিন্দুরা □ ১৮
বোধন : বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়েই শক্তি অর্জন ও সংরক্ষণ □ চতুর্থ পাণ্ডব □ ২১
ঐতিহাসিক দুর্গ রণথম্ভোর □ সোমশুভ্র চক্রবর্তী □ ২২
মন চল নিজ নিকেতনে □ অর্ণব নাগ □ ২৩
শাড়ীর ক্রমবিবর্তন □ কৃষ্ণকলি মুখার্জী □ ২৬
খোলা চিঠি : এক বছরেই ১০০ শতাংশ কাজ শেষ, দিদি এবার ছুটি নিন প্লিজ □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭
দিল্লীতে কোনও সরকার আছে কি? □ জয় দুবাসী □ ২৮
বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার চর্চা? □ ৩০
নিরাপত্তার কপালে ভাঁজ : রহস্যময় ‘বহিরাগত’দের অবাধ আনাগোনা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে □ ৩২
দিদির এক বছর □ নটরাজ ভারতী □ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □
সুস্বাস্থ্য : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ খেলা : ৩৯
□ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৮ মে - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

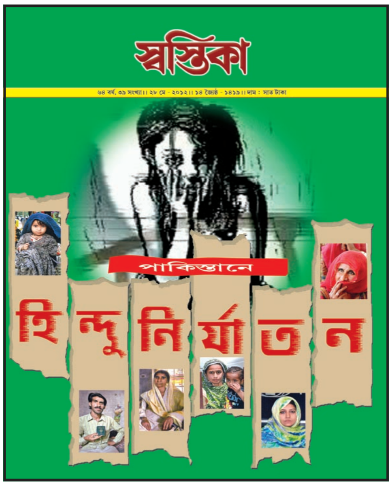

পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন
পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : জলদূষণ : কিংকর্তব্য ?

জলের অপর নাম জীবন— একথা আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখে এসেছি। কিন্তু জল দূষিত হলে জীবনও যে বিষময় হয়ে উঠবে, একথা আজও বোধহয় আমরা বুঝতে পারিনি। শহরায়নের ফলে জলের আকাল দেখা দিচ্ছে। তাই গভীর নলকূপ দিয়ে মাটির অনেক নিচে থেকে জল শোষণের ফলে জলে আর্সেনিকের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে চাষের জমিতে কীটনাশকের লাগামছাড়া ব্যবহারে পুকুর-নদীর জলও আর নিরাপদ নয়। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে স্বস্তিকার বিশেষ ভাবনা। লিখছেন — **নবকুমার ভট্টাচার্য ও অর্ণব নাগ।**

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য বিষয়ও।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

খেলা না মিথ্যার বেসাতি

ইহাকে খেলা না বলিয়া কি বলা যাইতে পারে তাহা লইয়া গবেষণা চলিতে পারে কিন্তু আই পি এল (ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ) ক্রিকেট এই মুহূর্তে ছেলেখেলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সমগ্র দেশ জুড়িয়া এক নতুন জুয়া খেলা শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ম্যাচ ফিক্সিং কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছে। তদন্ত হইলে দেখা যাইবে এই ক্রিকেট ব্যবসায় চলচ্চিত্র শিল্পীদের হাত দিয়া আই এস আই বা দাউদ ইব্রাহিমের টাকাও খাটিতেছে। প্রতিবারের মতো এই বারের আই পি এল ক্রিকেটে যেভাবে অধিকাংশ ম্যাচের ফয়সালা শেষ ওভারে ঘটিতেছে তাহাতে ক্রিকেট মহলে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি লইয়া সন্দেহ দানা বাঁধিয়াছে। সন্দেহ যে সঠিক তাহা পাঁচ নির্বাসিত খেলোয়াড়ের পরিণতিতে প্রমাণিতও হইয়াছে। বোর্ড প্রেসিডেন্ট নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন বলিয়াছেন, আই পি এল-কে দুর্নীতিমুক্ত রাখিতে যাহা যাহা করা সম্ভব বোর্ড তাহা করিবে। এই কথা বলিলেও বোর্ড প্রেসিডেন্ট নিজেই চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক এবং সেই দলও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। যাহারা চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লী ডেয়ারডেভিলসের খেলা দেখিয়াছেন তাহারা বুঝিয়াছেন কিভাবে বীরেন্দ্র সেহবাগের দল ব্যাটিং-এ ব্যর্থতা দেখাইয়া ধোনিবাহিনীকে জেতার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। আজ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে আই পি এল হইল মিথ্যার বেসাতি। ধান্ধাবাজ রাজনীতিবিদ্, চলচ্চিত্রজগৎ এবং দাউদ ইব্রাহিম সহ জুয়াড়িদের যৌথ ব্যবসা। এই খেলা ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরারও পরিপন্থী। খেলায় খেলোয়াড়রা চার মারিবার পরে অর্ধনগ্ন মহিলারা নাচিতেছেন, ওই মহিলারাই খেলোয়াড়রা ছয় মারিবার পরে ঊর্ধ্ববাহু তুলিয়া বুক কাঁপাইতেছেন—ইহাকে কি ভদ্রতা বা সভ্যতা বলা যাইতে পারে? খেলোয়াড়রা মহিলা লইয়া ফূর্তি করিতেছেন, মহিলাদের শ্লীলতাহানি করিতেছেন—ইহা কি আমাদের দেশের সংস্কৃতি, ভারতীয়ত্ব? সংসদে তাই আই পি এল বন্ধের দাবি উঠিয়াছে। বিজেপি সাংসদ কীর্তি আজাদ অনশনে বসিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। আই পি এল-এ কালো টাকার লেনদেন লইয়া যে সন্দেহ পোষণ করা হইয়াছে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব নিরসন হওয়া দরকার। বি সি সি আই ও আই পি এল-এর আয়-ব্যয়ের অডিট হওয়া উচিত। কোনখান হইতে অর্থ আসিতেছে এবং কোথায় যাইতেছে দেশবাসীর তাহা জানার অধিকার আছে।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অভদ্রতা ও গুণ্ডামির অভিযোগে শাহরুখ খানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে মুম্বাই ক্রিকেট সংস্থা। শাহরুখ খান আবার আমাদের এই রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। কিন্তু সংবাদপত্রে তাহার যে গুণ্ডামির ছবি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের লজ্জিত হওয়া উচিত। ভাবিতে লজ্জা হয় এই আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের নমুনা। শাহরুখের গুণ্ডামির প্রতিবাদে মুম্বাই ক্রিকেট সংস্থা ব্যবস্থা লইবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দিদির আবার গোঁসা হইয়াছে। বাদশাকে নাকি লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে! সংখ্যালঘুরা লঘু পাপ করিতেই পারেন। সংখ্যালঘু ভোটের লালসায় আজ লঘু-গুরু সব পাপ মকুব হইবার ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

বাঙলা দেশে অনেক কবি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতসমূহ সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং পল্লীগ্রামগুলিতে সেই সকল গান গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মসঙ্গীত এবং সেগুলির সারমর্ম এই যে, ধর্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে হইবে। এই ভাবটি সম্ভবতঃ ভারতীয় ধর্মসমূহের বিশেষত্ব। ভারতে ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোনও গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাবটি নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইবে—ইহাই ধর্ম। অনেক সাধুপুরুষের ঈশ্বরদর্শন-কাহিনী ভারতে সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তি। ভারতের আবহাওয়া সাধুসন্তদের ঈশ্বরদর্শনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য ওই গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনওরূপ যুক্তি দ্বারা ইহাদিগকে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহারা নিজেরা যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা নিজদিগকে ওইরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ওইসকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন, ইহজীবনেই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি বিকশিত হইলেই ধর্মের আরম্ভ। ইহাই সকল ধর্মের সার কথা।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

কলকাতা ও শহরতলিতে মাওবাদীরা আজও সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাওবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে আপাতত কিছুটা হতোদ্যম হলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তলে তলে তারা একটা বড় রকমের হামলা করার জন্য তৈরি হচ্ছে। এখনই না হলেও কিছুদিন পর সেই হামলা হতে পারে। গতবছরের ২৪ নভেম্বর শীর্ষস্থানীয় মাও নেতা কিষানজীর এনকাউন্টারে মারা যাওয়ার পর জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের কাজকর্ম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে লাল- সন্ত্রাসবাদীরা কলকাতা এবং লাগোয়া শহরতলিতে তাদের উপস্থিতি উদ্বেগজনক ভাবে বাড়িয়েছে—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এই মর্মে এক রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠিয়েছে বলে খবর।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই কেন্দ্র সরকারের কাছে এই রিপোর্ট জমা পড়েছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাওবাদীরা কলকাতা এবং সন্নিহিত শহরতলিতে তাদের জনভিত্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিবিধ এনজিও-র এক গোষ্ঠী। হাতে হাত মিলিয়ে তারা কাজ করছে। এনজিও-গুলো তাদেরকে বিদেশের টাকায় তহবিল যোগান দিচ্ছে। টাকা আসছে আমেরিকা এবং নরওয়ে থেকে।

মাওবাদী স্লিপার সেলের সদস্যরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গেও লাগাতার যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। ঘটনা হলো কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গোয়েন্দাদের কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শীর্ষস্থানীয় মাও নেতা এস রামকৃষ্ণকে কলেজ স্ট্রিট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। তারপরই মাওবাদী গতিবিধির বিষয়ে নিশ্চিত হয়। কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার একথা জানিয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যে মাও ডেরা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের যন্ত্রাংশ উদ্ধার করেছে। এসব অত্যাধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়েছিল যা দিয়ে সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা যেত।

কলকাতা পুলিশ কলকাতাভিত্তিক কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে বলে গোয়েন্দাসূত্রে জানা গিয়েছে। তাদের মতে এইসব বুদ্ধিজীবীরা মাওবাদীদের হয়ে সংযোগরক্ষাকারী

দেবলীনা চক্রবর্তী

মাওবাদীরা কলকাতাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনাত্মক গতিবিধি চালাতে চাইছে। সম্প্রতি নোনাডাঙ্গার বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে তারা ঢুকে পড়েছে। মাওবাদীদের মাতঙ্গিনি মহিলা সমিতির নেত্রী দেবলীনা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

এজেন্টের ভূমিকায় সক্রিয় ছিল। জঙ্গলমহল ছেড়ে কলকাতায় এবং শহরতলিতে আসা মাওবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থাও এরাই করতেন। এইসকল ছদ্মবেশী মাওবাদীরা জঙ্গলমহলের গ্রামে গ্রামে এবং 'ঝাড়গ্রাম পুলিশ জেলার' ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। রীতিমতো বারে বারে ছুটে বেড়িয়েছেন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর, বহুচর্চিত সিভিল সোসাইটির এইসব সদস্যরা। তাঁদের তহবিলের সোর্স হচ্ছে ইউরোপ এবং আমেরিকা। গোয়েন্দা সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে---- এনজিও গুলো নানা স্কীমে টাকা অনুমোদন করিয়ে তা মাওবাদীদের জন্য চালান করে দেয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, কীভাবে মাও নেতারা নাগা বিদ্রোহী এবং মণিপুরের পিএলএ-র মতো জঙ্গিদের সঙ্গেও লাগাতার যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের এক অফিসারের কথায়—"ওই পঞ্চমবাহিনীর বুদ্ধিজীবীদের ধরা রীতিমতো কঠিন। ওঁরা বেশ প্রভাবশালী। ব্যাপক সমর্থনের ভিত রয়েছে।"

কলকাতাই এখন মাওবাদীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবছরের বইমেলার সময় থেকে তাদের গতিবিধিও বেড়েছে। সূত্র মতে, মাওবাদীরাও ওই জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বইমেলায় উপস্থিত ছিল। বইমেলাতে উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তারা আলাপ- আলোচনাও করেছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মাওবাদীরা কলকাতাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনাত্মক গতিবিধি চালাতে চাইছে। সম্প্রতি নোনাডাঙ্গার বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে তারা ঢুকে পড়েছে। মাওবাদীদের মাতঙ্গিনি মহিলা সমিতির নেত্রী দেবলীনা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই জনপ্রিয় নেত্রী লালগড় এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং নেত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত ১৫ মে কলকাতায় যেসব মাওবাদীরা বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে বা দেবে---- তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি এখানে বন্দুকের সংস্কৃতি (গান-কালচার) সহ্য করব না।" তিনি মাওবাদীদেরকে বেকার যুবকদের বিপথ চালিত করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি মাওবাদীদের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে আগ্রহী, তবে কেউ যেন তাঁর সরলতাকে দুর্বলতা না মনে করেন।

বিদেশ দপ্তরের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অভিযোগ

ছাড়পত্র ছাড়াই ই ইউ-র প্রতিনিধি দলের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিদেশ মন্ত্রকের বিরুদ্ধে সম্প্রতি গুরুতর অভিযোগ দাখিল করেছে। অভিযোগের কারণ— প্রচলিত আইন অনুসারে যেখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র বা অনুমতি নেওয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সেখানে স্বরাষ্ট্র বিভাগকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেই ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আট সদস্যের ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া এবং স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূতরাও সামিল ছিলেন। তারা নাগাল্যান্ডে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব, বিধানসভার স্পীকার, বিবিধ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন এনজিও এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ১৫ মে ওই প্রতিনিধিরা নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্যপাল নিখিল কুমার-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেফিও রিও এঁদেরকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন।

গট-আপ গেম ?

এক প্রতিনিধি দল নাগাল্যান্ড সফর করেন। সন্ত্রাস উপদ্রুত নাগাল্যান্ডে গিয়ে ওই প্রতিনিধিদল রীতিমতো পরিকল্পনা অনুসারে রাজধানী কোহিমায় বিভিন্ন এনজিও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।

বিদেশী কূটনীতিকদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো সন্ত্রাসদীর্ণ এলাকায় যাওয়া এবং সংবেদনশীল ক্ষেত্রের লোকেদের সঙ্গে বৈঠক করা রীতিমতো উদ্বেগজনক ব্যাপার। এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানতে চাইছে যে ভ্রমণের আগে কেন নিরাপত্তা ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি? ওই প্রতিনিধিদল কি উদ্দেশ্যে নাগাল্যান্ডে এসেছিলেন? ঘটনা গত ১৪ মে'র। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রটোকল অনুসারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক এটা সবারই জানা।

সরকারি সূত্র অনুসারে-প্রতিনিধি দলে চেক-রিপাবলিক, হাঙ্গেরি,

সূত্রমতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। নাগাল্যান্ডের মতো সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত রাজ্যে বিদেশী কূটনীতিকদের সফর ও বৈঠকে ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এমন সব তথ্য বের হয়ে যেতে পারে যার ফলে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এছাড়া কায়েমী স্বার্থবাদীরা সন্ত্রাসের বিষয়টার বা নাগা-সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে পারে বলে সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। ইউরোপে নাগা সমস্যা নিয়ে প্রচার জোরদার করা হতে পারে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এরকম প্রতিনিধিদল নিয়ম ভেঙে নাগাল্যান্ড সফর করল আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানত না—এটা অবিশ্বাস্য।

আসলে প্রচার মাধ্যমে বিষয়টা চলে আসায় ড্যামেজ কন্ট্রোল করা হচ্ছে বিদেশমন্ত্রককে প্রতিবাদ দাখিল করে। গট-আউট গেম খেলা হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুজরাট মডেল পশ্চিমবঙ্গেও

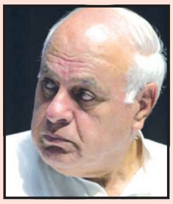

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ মে রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরকালে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'ওয়াটার ক্যানেল-টপ সোলার পাওয়ার প্লান্টের' মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণ শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। তিনি বলেন, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের দামোদর ঘাঁটি পরিযোজনায় ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায়। মোদি এ ব্যাপারে দেশকে পথ দেখিয়েছেন বলে শ্রী আবদুল্লা মন্তব্য করেন। তাঁর কথায় গুজরাটে এবছর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এই পদ্ধতি সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বিরাট জমির কোনও প্রয়োজনই নেই। মাত্র ৭৫০ মিটার লম্বা খালের জলই যথেষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর ঘাঁটি নিগমের (ডি ভি সি) ২০০০ কিমি-র বেশি বাঁধ রয়েছে। ওখানে কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোদীর গুজরাট মডেলকে প্রয়োগ করতে চায় বলে শ্রী আবদুল্লা জানিয়েছেন। মোদীর রাজ্যে ১ মেগাওয়াটের ছোট্ট 'ওয়াটার ক্যানেল-টপ সোলার পাওয়ার প্লান্ট' শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুজরাটের প্রতিটি গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে।

ওই পদ্ধতি প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে দামোদর ঘাঁটিতে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এই প্রসঙ্গে ফারুক আবদুল্লা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও প্রশংসা করেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, গুজরাট ও রাজস্থানের এই উন্নতি অনেকের চোখেই পড়ছে না। তিনি আরও বলেন, তাঁর মন্ত্রক এব্যাপারে ইচ্ছুক বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্য করতে আগ্রহী। তা সেই রাজ্যে যে কোনও দলের সরকার থাকুক না কেন। বিরোধী পক্ষ টেবিল চাপড়ে ফারুক আবদুল্লাকে বাহবা জানান। বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদও এজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সাধুবাদ দেন।

ফারুক সাহেবের বক্তব্য— হিন্দুস্থান বাঁচলে সবাই বাঁচবে। সম্প্রতি দেশে ৯৭৯ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প হয়েছে। তার মধ্যে গুজরাটেই ৬৫৪.৮ মেগাওয়াট বলে তিনি রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে জানিয়েছেন।

৮৫০ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারিতে জড়ালেন গুজরাটের কংগ্রেসী রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের রাজ্যপাল কমলাদেবীর ৮৫০ কোটি টাকার জমি-কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজস্থান সরকারের কাছে রিপোর্ট দাবি করল খোদ কং-নেতৃত্ব। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের কাছে কিষাণ সামূহিক কৃষি সহকারী সমিতি লিমিটেড (কে এস কে এস এস এল)-র ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। অভিযোগ, বিশাল জালিয়াতিতে অভিযুক্ত এই সংস্থাটির এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য গুজরাটের রাজ্যপাল।

দৃশ্যতই এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। উল্লেখ্য, এই রাজ্যপালই কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিলেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, গত ১৮ মে এনিয়ে রাজ্যসভায় বিজেপি হইচই করা এবং রাজ্যপালের পদ থেকে কমলাদেবীকে প্রত্যাহার করার দাবি যে খুব একটা অযৌক্তিক নয় কং-নেতৃত্বের এই পদক্ষেপই তা প্রমাণ করছে। সূত্রের খবর, গত ১৯ মে গেহলট সরকারের শীর্ষ আধিকারিকেরা আলোচনায় স্থির করেন কে এস কে এস এস এল-র সঙ্গে কারা যুক্ত তা খুঁজে বের করা হবে এবং আইন অমান্যের জন্য সংস্থাটির বিরুদ্ধে চার্জ আনা হবে। যৌথ খামারের জন্য সমিতিকে যে জমি দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমি জবরদখলের মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে ওই কৃষি সমিতিটির বিরুদ্ধে।

দেশে সাম্প্রতিককালে বহু কংগ্রেসী দুর্নীতির মধ্যে এই দুর্নীতিটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। কারণ একটি রাজ্যের প্রশাসনিক দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তি অপর রাজ্যে একটি দুর্নীতির সঙ্গে যেভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছেন তাতে বিচার-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রভাবিত করার আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক মহল। সবচেয়ে বড় কথা এই সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আজকের নয়। ২০০৫-এ সমিতিটির বিরুদ্ধে গুরুতর

কমলাদেবী

অনিয়মের অভিযোগে রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিস', জয়পুর, রাজস্থান একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। যাদের দায়িত্ব ছিল কে এস কে এস এস এল-এর প্রতিষ্ঠা, কাজ এবং আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি খতিয়ে দেখা। সমস্ত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়ে তদন্ত কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রার ২০০৯ সালের ২ জুলাই রাজস্থান সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রধান সচিবের কাছে লিখে পাঠান যে কো- অপারেটিভ আইনের ৫৫ (৫) (৬) ধারায় কে এস কে এস এস এলকে বাতিল করা দরকার। কিন্তু ২০১০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী পরসাদীলাল মীনা তাঁর পি-৩ (৬৬) কো-অপ/০৯ আদেশবলে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং রেজিস্ট্রারের সুপারিশ বাতিল করে দেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সব জেনেশুনে ওই জাল সংস্থাটির কার্যকরী সমিতিতে কিভাবে রইলেন গুজরাটে রাজ্যপালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন কমলাদেবী। তিনি বিষয়টা জানতেন না এমনটা হতে পারে না।

সুতরাং তাঁকে এখানে 'ব্যবহারে'র অভিযোগও ধোপে টিকবে না। আর কংগ্রেস নেতৃত্ব যেভাবে বিপাকে পড়ে সবকিছু খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে তাতে এটাই কংগ্রেসী দুর্নীতির দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর তালিকায় নবতম সংযোজন কিনা সেটাই রাজনৈতিক মহলের মুখে মুখে ফিরছে।

গত ২১ মে কলকাতার ধর্মতলায় বিজেপির আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

আসন্ন নির্বাচনগুলিই তৃণমূল সরকারের ‘অ্যাসিড টেস্ট’

গূঢ়পুরুষের কলম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা মাটি মানুষের সরকারের বর্ষপূর্তি হয়েছে ২০ মে। এরপরেই জুন মাসে পরিবর্তনের সরকারের প্রথম ‘অ্যাসিড টেস্ট’। সামনের জুনেই রাজ্যের ছয়টি পুরসভার ভোট এবং দুটি বিধানসভার আসনে উপনির্বাচন। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৩-তে রাজ্যজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। কলকাতায় প্রায় সব খবরের কাগজেই পাতাজোড়া সরকারি বিজ্ঞাপন এবং মমতার এক বছরের সাফল্যের মনগড়া বিশ্লেষণের বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে একটা কথাই মনে পড়েছে যে সাফল্যের মূল্যায়ন করার অধিকার আছে একমাত্র বাংলার মানুষের। তাঁরাই পরিবর্তন এনেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের ছ’ কড়া ন’ কড়া নেতারা নয়। এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নন। সিপিএমের সাড়ে তিন দশকের জনবিরোধী শাসনের অবসান ঘটাতে বাংলার মানুষ মমতার দলকে সমর্থন করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চেয়েছিলেন তাই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। এখন উন্নয়নের সাফল্য নিয়ে তৃণমূলের চুনোপুঁটি থেকে প্রধানা নেত্রী যেভাবে দাপাদাপি করছেন তাতে রাজ্যের জনগণ খুশি না অখুশি তার নমুনা সামান্য হলেও জানা যাবে জুনের নির্বাচনের ‘অ্যাসিড টেস্ট’। গত বছর মে মাসে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তৃণমূল দল। সেই জনপ্রিয়তায় ভাটার টান ধরেছে কিনা সেটাই দেখার।

ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র এবং কলকাতারই ভবানীপুর ও উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন। জনসমর্থনে ভাটার টান মোটেই দেখা যায়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে প্রথম ছয় মাস যে কোনও দলের সরকারের ‘হনিমুন পিরিয়ড’ বলেই পরিচিত। তাই এই সংক্ষিপ্ত সময়ে নির্বাচনের ফলাফল সরকারের জনপ্রিয়তা কমা বা বৃদ্ধির মাপকাঠি হতে পারে না। কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর একটা সরকারের কাজকর্মের ভালমন্দ বিচার করেই ব্যালটের মাধ্যমে মানুষ রায় দেয়। বিশেষ করে গত পাঁচ মাস শিশু মৃত্যু, নারী ধর্ষণ, ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের নামে কলেজে কলেজে মারদাঙ্গা, শিক্ষক নিগ্রহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেত্রীর বিতর্কিত মন্তব্য বাংলার মানুষ ভাল চোখে দেখেননি। রাজ্যে মুসলিম তোষণে মমতার ভূমিকা অতীতে কংগ্রেস-সিপিএম সরকারকে ছাপিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানি পোশাকে নামাজে যোগ দিয়েছেন এমন ছবি খবরের কাগজে দেখেননি এমন পাঠক বিরল। মমতা বিশ্বাস করেন যে পশ্চিমবঙ্গের ‘মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক’ তাঁকে এবং তাঁর দলকে নির্বাচনে জিতিয়েছে। মুসলিম সমর্থন ঠিকঠাক বজায় থাকলে ভবিষ্যতে কোনও নির্বাচনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা পরাজিত হবেন না। হ্যাঁ, ঠিক এই কারণেই মমতা প্রাণপণে মুসলিম তোষণ নীতি আঁকড়ে ধরেছেন। তবে লাভ নেই। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিংহ এবং বিহারে লালুপ্রসাদ একদা ক্ষমতা ধরে রাখতে এমনই তোষণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। মূলায়মের দল সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরলেও লালুজী সুবিধা করতে পারেননি। অ-মুসলিম রাজনৈতিক দলের জানা উচিত যে তারা শত চেষ্টা করলেও মুসলিম ভোটদাতাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না। পারিবারিক পদবি বিসর্জন দিলেও পারবেন না। ইসলামে সেকুলার কথাটি নেই। যা আছে তা হলো, ‘ফেইথফুল’ বা বিশ্বাসী অথবা ‘আনফেইথফুল’- অবিশ্বাসী। সত্যিকারের মুসলমান একজন ইসলামে অবিশ্বাসীকে সমর্থন করতে পারে না। মুসলমানি পোশাকে ঘোরাফেরা করলেও না। সাময়িকভাবে কিছু সুবিধা পেতে লোক দেখানো সমর্থন করলেও মন থেকে সমর্থন করবে না। যত তাড়াতাড়ি নেত্রী এই সোজা সরল সত্যটি বুঝতে পারেন ততই তাঁর দলের মঙ্গল।

> **তৃণমূল যদি জোট ছাড়াই বিরোধীদের দখলে থাকা পুরসভাগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে এবং আগে জেতা দুটি বিধানসভার আসন ধরে রাখতে পারে তবেই বোঝা যাবে পরিবর্তনের নয়া সরকারের এক বছরের কাজে বাংলার মানুষ খুশি।**

যে ছয়টি পুরসভায় ৩ জুন রবিবার ভোট হচ্ছে তার মধ্যে দুর্গাপুর, হলদিয়া, ধূপগুড়ি বামেদের হাতে রয়েছে। পাঁশকুড়া ও নলহাটি কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের দখলে। নদিয়া জেলার কুপার্স পুরসভা এককভাবে কংগ্রেসের হাতে আছে। গত বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে এই ছয়টি পুরসভার কোনওটাতেই বামেদের জেতার কথা নয়। হলদিয়ার মুকুটহীন বাদশা সিপিএমের লক্ষ্মণ শেঠ ও তাঁর দলবল এখন জেলে। ফলে সিপিএম হলদিয়ায় অত্যন্ত দুর্বল। এখন দেখার তৃণমূল তার একক শক্তিতে ছয়টি পুরসভা দখল করতে পারে কিনা। মনে রাখতে হবে গত বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটবদ্ধভাবে লড়েছিল। এবার পুরসভার নির্বাচনে জোট হয়নি। বাম বিরোধী তিনটি প্রধান দল— তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বিজেপি পৃথক পৃথকভাবে প্রার্থী দিয়েছে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে। ফলে রাজ্যের ৪৪ বা ৪৬ শতাংশ বামভোট তেমনভাবে ভাগ হবে না। বাম বিরোধী ভোট কতটা ভাগ হবে সেই অঙ্কের উপর নির্ভর করছে নির্বাচনে জয় পরাজয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার অনুমান, ভোট বিভাজন যথেষ্টই হবে। নেত্রীর দলবলের কার্যকলাপই রাজ্য থেকে নির্বাসিত সিপিএমকে পুনর্বাসনে সাহায্য করবে। এই ভোট বিভাজনের জন্যই অতীতে সাতবার বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছিল। তবে তৃণমূল যদি জোট ছাড়াই বিরোধীদের দখলে থাকা পুরসভাগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে এবং আগে জেতা দুটি বিধানসভার আসন ধরে রাখতে পারে তবেই বোঝা যাবে পরিবর্তনের নয়া সরকারের এক বছরের কাজে বাংলার মানুষ খুশি। ভুললে চলবে না যে মানুষই শেষ কথা বলে।

রাজ্য রাজনীতি

সরকারের বর্ষপূর্তিতেও অধরা ‘পরিবর্তন’

নিশাকর সোম

সাম্প্রতিক রাজ্য-রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এক পক্ষের পরাজয় বরণের বর্ষপূর্তি, অপরপক্ষের মন্ত্রিসভার বর্ষপূর্তি।

গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম এবং বামফ্রন্ট তলানিতে চলে গেছে। আজও সেই ট্র্যাডিশন চলেছে। পরাজয় বরণের বর্ষপূর্তির সময়েও সিপিএম-এর প্রতিটি জেলা কমিটিতে ক্ষমতার লড়াই। সেই লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলায়। কোনও নীতির লড়াই নয়, নেতৃত্বের লড়াই।

নতুন সরকারের সামনে পরাজিত ব্যর্থ বুদ্ধ-মন্ত্রিসভা আর্থিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি করে চলে গেছে। বিশেষত অন্তিমের দু'বছর রাজ্যে কোনও শাসন বা শাসক থাকা টের পাওয়া যায়নি। তাই মমতা মন্ত্রিসভাকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে এগোতে হচ্ছে।

মমতাদেবীর কাজের একটা প্রবণতা আছে—তা হলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং সমাধানের ঘোষণা। স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি প্রথমেই হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেন। অব্যবস্থা দূর করার পদক্ষেপ নিলেন। এই পদক্ষেপ নেবার সময় এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তাকে অপমানিত বোধ করতে হলো। তিনি চলে যেতে চাইলেন। তিনি বলেছিলেন, “ডিউটি শেষ করে নির্দিষ্ট ঘরে বসে আলোচনা করবেন। বিরাট জনসমক্ষে আলোচনা করা যায় না।”

এই এসএসকেএম হাসপাতালের বর্তমানে আউটডোরের একটি চিত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানাই। তাহলো নেফ্রলোজি বিভাগের আউটডোরে সকাল ৮টায় গিয়ে দেখা গেল ৫০০ লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে এক রোগগ্রস্তা ছিটকে পড়ে গেল। পাহারাদার পুলিশকে তিনি সাহায্য করতে বললেন। পুলিশ বলেছিল, তিনি বাড়ি চলে যান। যথারীতি ক্লাস ফোর স্টাফ-এর ব্যবস্থাপনা বজায় রয়েছে। তবে ধীরে হলেও সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার উন্নতি ঘটে চলেছে।

মমতা হস্তক্ষেপ করলেন শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাঁর মন্ত্রিসভার বিদ্যালয় মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সমস্ত জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের পদত্যাগ করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা পদত্যাগ করলেন। রবীনবাবুকেও শিক্ষা থেকে কৃষিমন্ত্রীতে বদলি করে দেওয়া হলো। বর্তমানে রবীনবাবু অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রীদের মনিটারিং সভায় তাঁকে ডাকা হয় না। রবীনবাবু সিঙ্গুরের আন্দোলনের নেতা এবং নির্বাচিত বিধায়ক। তিনি মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে শিক্ষা দফতরের একমাত্র মন্ত্রী হলেন ব্রাত্য বসু। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় কমিটি, ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ব্যাপক পরিবর্তনের’ ব্যবস্থা হচ্ছে। একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য ছাড়া আর সমস্ত উপাচার্যকে সরে যেতে হয়েছে।

তৃণমূলের বিজয়ে অন্যতম সারথি সুনন্দ সান্যালকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রাত্য বসু তো সিনেমা অভিনয় নাট্য পরিচালনার অনুমতি পেয়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। শিক্ষায় দলতন্ত্রের একটি ছোট উদাহরণ—প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি কমিটিতে যাদবপুর- রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সিপিএম পন্থী প্রাক্তন উপাচার্যকে কমিটিতে নেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল সমালোচনা করা হলো। সমস্ত মাদ্রাসাকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষার ব্যাপারে সিপিএম-এরই কায়দায় চলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রী রবিরঞ্জন চ্যাটার্জীও সমালোচক। শিক্ষার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীই এখন শেষ কথা।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতে ‘মৌলিক’ পরিবর্তন আনা হয়েছে। মমতার রাজনীতির গুরু একদা ‘তরমুজ’ বলে অভিহিত সুব্রত মুখার্জিকে এই দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এছাড়া পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সরকারি আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যুক্তি হল, সরকারি বেনিয়ম বন্ধ করার জন্য এব্যবস্থা। বস্তুত তৃণমূল স্তরে জনগণের ক্ষমতার আধারটির নিয়ন্ত্রক হলেন সরকারি আমলারা। এই নিয়েই সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। গ্রামের মানুষ উৎসাহিত হয়ে ভোট দেবেন। গ্রামীণস্তরে নানা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনের এক বছর আগেই এর ফল গ্রামের মানুষ পাবেন।

বিদ্যুৎ দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই ছিল। বিদ্যুৎ-এর উন্নতি না হলে শিল্পের সম্ভাবনা হবে না। বর্তমানে বিদ্যুৎমন্ত্রী হলেন প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি মনীশ গুপ্ত। তিনি বলেছেন, বিদ্যুৎ ব্যাঙ্ক করা হচ্ছে! বিদ্যুৎ-এর কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, দক্ষিণ কলকাতায় বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে— মহেশতলার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণেই নাকি এই ঘাটতি। প্রসঙ্গত,মহেশতলার বিধায়ক হলেন কলকাতার মেয়রের শাশুড়ি। মহেশতলার পৌরকর্তা হলেন মেয়রের শ্বশুর!

পরিবহন দফতরের দায়িত্ব মদন মিত্রের। রাজ্য সরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রীদ্বয় শ্যামল চক্রবর্তী ও সুভাষ চক্রবর্তী এক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে গেছেন। ফলে এখন এই ব্যবস্থাকে বদল করা এক কঠিন কাজ। তবে প্রধান অসুবিধা হচ্ছে— কর্মচারী ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ট্যাক্সি চালকদের মধ্যেও মদন মিত্র সম্পর্কে বিরূপতা দেখা যাচ্ছে। ট্রামের বিজ্ঞাপন বেড়েছে। স্টেটবাসের সংখ্যাও বেড়েছে। স্টেটবাসের কর্মীদের মধ্যে নিয়মমতো বেতন-পেনসনের ব্যাপারে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন সরকারের বর্ষপূর্তির সামনে রাজ্যের বেকারি ভয়াবহ অবস্থা দেখা যাচ্ছে—কয়েক হাজার চাকরির জন্য কয়েক লক্ষ আবেদন করছেন। মুখ্যমন্ত্রী তো এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের ঘোষণা করেছেন। পরাজিত সরকার এক ঋণের বোঝা চাপিয়ে গেছে। ফলে আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে বর্তমান সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রকে সুদ দেবেন না। আর্থিক সঙ্কট মেটানোর সঙ্গে কয়েকটি ব্যয় বড়ই বেমানান। যেমন—মন্ত্রীদের বেতন মাসে ৩০ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৩৭ হাজার করা। মন্ত্রীদের ঘর সাজানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়। ঢালাও ভাবে পুরস্কার মূল্য দেওয়া। শিল্পীভূষণ-বঙ্গভূষণ ইত্যাদি দেওয়া। গঙ্গাপাড়ের সৌন্দর্যায়নের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়। মন্ত্রী-বিধায়কদের চিকিৎসার বিলের কোটি কোটি টাকা। এ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর আপত্তি। মহাকরণের কয়েকটি প্রকল্পতে বাধা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। কারণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় হবে। সর্বশেষ আর্থিক ব্যয়ের একটি ঘটনা হলো—শাহরুখ খানকে রাজ্যের প্রচার ব্র্যান্ড করা। তিনি ৯০ মিনিটের একটি বিজ্ঞাপনী প্রচারচিত্র করেছেন। তার ব্যয় দু' কোটি টাকা।

মুসলিম তোষণে বাম থেকে তৃণমূল

কোনও 'পরিবর্তন' নেই, আছে 'পরিবর্ধন'

ভাস্কর ভট্টাচার্য

সোজা-সাপ্টা

ইমাম-ভাতা

> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়, নীতি ও সত্যের প্রতীক বলে আমরা শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি সকল পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য (সব সম্প্রদায়ের জন্য) দায়বদ্ধ। আমরা চাই সকল পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সমানভাবে সরকারি তহবিল ব্যবহৃত হোক। পবিত্র ধর্মগুরুদের টাকার লোভ দেখিয়ে অপমান করার কোনও অধিকার মুখ্যমন্ত্রীর নেই।**

আমাদের সংবিধান তৈরি হওয়ার সময় থেকে আমরা দেখে আসছি সংরক্ষণের ব্যবস্থা। সেই সময় পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে আনার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ১০ বছরের জন্য রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাতে তার মধ্যে এই সব পিছিয়ে পড়া জনজাতির উন্নতি করা যায়। পরবর্তী কালে আমরা দেখেছি এই সংরক্ষণ সারা ভারতবর্ষে ভোটের একটা অস্ত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার জন্য সংরক্ষণ নামক খুড়োর কল ঝোলানো হয়। কারণ এত সংরক্ষণ করেও স্বাধীনতার ৬০ বৎসর পর আমরা দেখি যে এখনও প্রায় ৮০ শতাংশের বেশী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। অর্থাৎ এই সংরক্ষণের নামে যে টাকা বাজেট থেকে নির্ধারণ করা হয় তার বহুলাংশ উন্নয়নের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় না। এই তহবিল কোথায় যায়, কার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তা আজও স্পষ্ট নয়। কোটি কোটি টাকার নয়ছয় হচ্ছে দরিদ্রদের বা পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের নামে। অথচ তারা যেখানে থাকার সেখানেই আছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছি যে শাসক তৃণমূল দলও সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, যা আগে বাম শাসকেরা করেছে। এই এক জায়গায় কোনও 'পরিবর্তন' নেই, আছে পরিবর্ধন। সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার আশায় তৃণমূল নেত্রী দ্বিধাহীনভাবে নির্লজ্জভাবে সংখ্যালঘু তোষণ করে চলেছেন। প্রথমে ওবিসি'র নাম করে সংখ্যালঘু মুসলিম সংরক্ষণ। এখন আবার ইমামদের ভাতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন কাঠা জমি ও বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। শুধু তাই নয়, তাঁকে একবারও বলতে শুনলাম না যে শিখ, জৈন, খৃষ্টানদেরও একই সুবিধা দেওয়া হবে কারণ এরাও তো সংখ্যালঘু।

বিজেপি এর ঘোর বিরোধিতা করেছে। এই বিরোধিতা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এ বিরোধিতা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির। কারণ সরকার সবার জন্য। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবার সময় যা উচ্চারণ করেছিলেন সপার্ষদ, তা তিনি চিলেকোঠায় তুলে রেখে, শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়কে ভোটের জন্য তুষ্ট করার খেলায় মেতেছেন যা কংগ্রেস এতদিন ধরে করে আসছে। ভাতা কাদের দেওয়া হয়, যারা রোজকার করে না, বেকার অথচ সরকার তাদের কাজ দিতে অক্ষম। যারা গরীব, যারা সমাজে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে অথচ সংসারে রোজগেরে কেউ নেই। এই রকম অবস্থায় কি শুধু মুসলিমরাই আছে পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দু, শিখ, জৈন, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য মানুষ আছেন যারা আজ সরকারের এই একমুখো নীতির জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এইভাবে সমাজে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়কে আলাদা করে দেখার যে প্রবণতা তাকে আমরা কি বলব? সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কি বলার থাকতে পারে? আজ হিন্দু, মুসলিম সবাই এক সমাজে এক সঙ্গে ভাই ভাই হয়ে সহাবস্থান করছে। প্রত্যেকের সমান অধিকার নিয়ে তারা একে অন্যের পাশে। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূল সরকার যে খেলায় মেতেছে তা আগামী দিনে এক অশুভ সংকেত বহন করছে। তারা সমাজের এই স্থিতিশীলতার শিকড়ে সাম্প্রদায়িকতার কুঠারাঘাত করছে, যা আজ সাধারণ মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে। বিজেপি এই অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। তারাই মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে ভোটের প্রত্যাশা না করে। মুসলিম সম্প্রদায় যেদিন বুঝতে পারবে এই রাজনীতির নোংরা খেলা, সেদিন তারা দলবদ্ধভাবে বিজেপি'র পাশে এসে দাঁড়াবে এবং দাবী করবে সত্যিকারের উন্নতির জন্য, যা বিজেপি দেবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ব্যাপারে মামলা চলছে প্রধান বিচারপতি শ্রী প্যাটেলের ঘরে। বিজেপি'র রাজ্য লিগ্যাল সেলের পক্ষ থেকে এই মামলায় লড়ছেন এ্যাডভোকেট শ্রী কৌশিক চন্দ। যতদূর জানা যায়, আগামী ৬ জুন এই মামলার আবার শুনানি এবং সরকার পক্ষকে হলফনামা দিতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে যদি সরকার কোনও টাকা এই ভাতা বাবদ দিয়ে থাকে এবং যদি জিতে যায়, তবে সেই টাকা সরকারকে ফেরত দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এক রায়ে ঘোষণা করে ইমামদের ভাতা দেওয়া যাবে, তবে তা ওয়াকফ বোর্ড দিতে পারবে এবং দিলে সমস্ত ইমামকে দিতে হবে। বর্তমানে সরকারের কাছে কোনও সঠিক হিসাব নেই যে, রাজ্যে কতজন ইমাম আছে। তারা ৩০ হাজার ইমামকে টাকা দেবে বলে ঘোষণা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়, নীতি ও সত্যের প্রতীক বলে আমরা শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি সকল পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য (সব সম্প্রদায়ের জন্য) দায়বদ্ধ। সেখানে বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনও জায়গা নেই।

আমরা চাই সকল পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সমানভাবে সরকারি তহবিল ব্যবহৃত হোক। পবিত্র ধর্মগুরুদের টাকার লোভ দেখিয়ে অপমান করার অধিকার মুখ্যমন্ত্রীর নেই।

সংসদে অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক উষ্মা কিসের ইঙ্গিত?

এন. সি. দে

লোকসভায় অর্থ বিল, ২০১২'র উপর বিতর্কের সমাপ্ত ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অনেক গরম গরম বুলি আওড়েছেন। সেই সমস্ত বুলিগুলি যতটা আর্থিক, তার চেয়ে ঢের রাজনৈতিক। বলা বাহুল্য সেই রাজনৈতিক বুলির মর্মকথা একান্তই দলীয়। তাঁর এই উষ্ণ ফাঁপা বুলিতে আর্থিক সংকট মোচনের ভূমিকার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে নিজেদের দলের সংকট মোচনের ভূমিকা। কেন তিনি হঠাৎ দেশের গভীর আর্থিক সংকট মোচনের চেয়ে দলীয় রাজনৈতিক সংকট মোচনের পরিত্রাতা হয়ে উঠলেন? পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও ঠিক একই ভাবে গর্জে উঠেছিলেন পশ্চিমবাংলার চির পরিচিত আর্থিক অবহেলার নেপথ্য কারিগর, ইন্দিরা-রাজীব- সোনিয়া ও রাহুলের এই পোষ্য মানুষটি। মুম্বাইয়ের হোটেলে, স্টেশনে ও কয়েকটি বাড়িতে যে বর্বর জঙ্গী হানা হয়েছিল ২০০৯-এর নির্বাচনের আগে, গান্ধী পরিবারের আস্থাভাজন এই কীর্ণাহারের বাঙালী ব্রাহ্মণটি পাকিস্তানের নিন্দায় এমনকী প্রধানমন্ত্রীকেও ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমনই গর্জে উঠেছিলেন যে বোধ হচ্ছিল পেলে পাকিস্তানকে গিলেই খেয়ে ফেলতেন। প্রতিদিনই পাকিস্তানকে হুমকি দিচ্ছিলেন। জঙ্গীদের নামের তালিকা দিয়ে পাকিস্তানকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হয়েছিল এদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া না হলে ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য পাকিস্তানকে প্রস্তুত থাকতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জাতীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিতে জাতীয় স্বার্থের নাম করে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে এক মেকি সংঘাতের বাতাবরণ তিনি তৈরি করেছেন। দেশকে এক চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। এই অবস্থায় নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কংগ্রেস তালে আছে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার। তারই ইঙ্গিত রয়েছে অর্থমন্ত্রীর ভাষণে।

এইভাবে হুমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বিরোধীদলকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়ে কংগ্রেসই হয়ে উঠেছিল দেশের জাতীয়তাবাদের চ্যাম্পিয়ন। দেশের আর্থিক দৈন্যদশা কোনও ইস্যুও হয়ে উঠতে পারেনি বিরোধী নেতৃবৃন্দের কাছে। কংগ্রেসী নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজির বলে বিরোধীদলের ভরাডুবি হয়েছিল। বিজেপি বারবার কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনের আগেও ঠিক একইভাবে গুজরাতে দাঙ্গা লাগাতে গোধরা কাণ্ড ঘটিয়েছিল, সেই দাঙ্গাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বিজেপিরই সযত্নে লালিত কার্গিল বিজয়ের অস্মিতা, পরমাণু বিস্ফোরণে গড়ে ওঠা জাত্যাভিমান, মার্কিন অনুদানের উপর নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে গড়ে তোলা স্বনির্ভর শক্তিশালী ভারতীয় অর্থনীতির জাতীয় গৌরব চেতনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতির বিজয় রথ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ষড়যন্ত্রীমশাই-এর ষড়যন্ত্রে। ২০০৪-এর নির্বাচনেও প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল

যে হঠাৎ হঠাৎ ভালো-মানুষী দেখিয়ে সংসদীয় বদান্যতা প্রদর্শন করে শাসক দলের গুডবুকে থাকার অপচেষ্টার অনেক উদাহরণ এদের আছে। যখন তখন শাসক দলের কাজের প্রশংসা করে ব্যক্তিগত বিবৃতি দিয়ে দলের নীচু তলার কর্মী ও সমর্থকদের বিপদে ফেলতেও এদের জুড়ি নেই। হিন্দুত্বের আদর্শে বিশ্বাসী বহু মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে আত্মনির্ভর জাতীয় অর্থনীতির প্রবক্তা সংঘের আদর্শে লালিত বি. জে. পি কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔরসজাত কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক আর্থিক নীতির মধ্যে নিজেদের মিল খুঁজে পেল! জাতীয় অর্থনীতিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত করেছিল বলেই তো এক সংঘ-ঋষি দত্তোপন্ত ঠেংড়িজী স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেছিল— এই কংগ্রেসীদের ডাংকেল চুক্তিতে সই করে জাতীয় অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বন্ধক রাখার বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতাদের বল্গাহীন বিবৃতি লেখনী কিংবা মন্তব্যের খেসারত দলকে বারবার দিতে হয়েছে। সংসদে অর্থমন্ত্রীর যে ভাষণকে কেন্দ্র করে এতগুলো কথা বলতে হল তা নিতান্তই একটি তুচ্ছ বিষয় হলেও তিনি তাতে জাতীয় স্বাভিমানের হাওয়া দিয়েছেন কারণ তিনি জানেন সংঘ ও বিজেপিকে রুখতে মেকি জাত্যাভিমানই একমাত্র অস্ত্র। বিষয়টি হল ভোডাফোনের কাছে বকেয়া কর আদায়। ২০০৭-এ ব্রিটিশ সংস্থা ভোডাফোন হংকংয়ের হাচিসন এসারে-র ৬৭% শেয়ার কিনে নিয়েছিল। হাচিসনের ব্যবসার একটা বড় অংশ ভারতে হলেও এই চুক্তি যেহেতু সই হয়েছিল ভারতের বাইরে ক্যারিবীয় সাগরের কেম্যান আইল্যান্ডে, সেই যুক্তিতে ভোডাফোন কোনও কর দেয়নি। কারণ এই দেশটি একটি করমুক্ত (Tax heaven) দেশ। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে প্রভাব খাটিয়ে এমন কিছু গরীব দেশকে করমুক্ত করে রাখে যে দেশগুলোর মধ্য দিয়ে অবৈধ কালো টাকা যা অর্থনীতিতে Hot Money হিসেবে পরিচিত ভারতের মতো দেশে ঢোকে। যেহেতু এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের Double Taxation Avoidance Agreement নেই, সেই জন্য বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এইসব দেশে ব্যবসায়িক লেনদেন করে সেখান থেকে ঘুরপথে ভারতে অবৈধ বিনিয়োগ করে। কিন্তু কর দেয় না। ভারত সরকার তার আয়কর দপ্তরের মাধ্যমে ভোডাফোনের কাছে কর ও জরিমানা আদায়ের নোটিশ পাঠায়। ভোডাফোন সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হলে শীর্ষ আদালতও এই পুরাতন কেস বেআইনি বলে ভোডাফোনের পক্ষেই রায় দেয়। আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হিসেবে সংসদকেই বেছে নিয়েছে সনিয়া কংগ্রেসের বিশ্বস্ত দূত প্রণব মুখার্জি। অর্থবিলকেই তিনি ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থবিল পাশ করিয়ে নিয়েছেন। বাজেটে উল্লিখিত আয়কর আইনের সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন বিদেশী সংস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় ভাবাবেগ উস্কে দিয়ে। তিনি আদালতকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, বিচার বিভাগ শেষ কথা নয়। সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও ভোডাফোনকে কর ছাড় দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যেই সংসদে আয়কর আইনে যে প্রস্তাব তিনি পেশ করেছেন তা কার্যকর করা হচ্ছে ১৯৬২-র ১ এপ্রিল থেকে।

এইভাবে জাতীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিতে জাতীয় স্বার্থের নাম করে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে এক মেকি সংঘাতের বাতাবরণ তিনি তৈরি করেছেন। দেশকে এক চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। এই অবস্থায় নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কংগ্রেস তালে আছে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার। তারই ইঙ্গিত রয়েছে অর্থমন্ত্রীর ভাষণে। তিনি বলেছেন, ‘‘সর্বোচ্চ আদালত কোনও বিষয়ে রায় দিতে পারে ঠিকই। কিন্তু বৃহত্তর উদ্দেশ্যে তা সংশোধনের অধিকারও আইনসভার সদস্যদের রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না সামাজিক আইন প্রণয়নের প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধী একবার সরকার ভেঙে দিয়ে ভোটে যেতেও দ্বিধা করেননি।’’ তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছদ্ম জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ভয়টা তার এইসব গরম গরম বুলির জন্য নয়, ভয়টা হলো ভালো মানুষ বিরোধী নেতাদের নিয়ে। তারা ষড়যন্ত্রী মশাইয়ের ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারেননি। তারাও যথারীতি হাততালি দিয়ে অর্থবিল পাশ করে দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত রকম আর্থিক সংকটের দায় সুকৌশলে বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্যই আর্থিক সংস্কারের বিল পাশ করা যাচ্ছে না কর ফাঁকি রুখতে আইন পাশ করাতে পারছেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোডাফোনের কাছ থেকে কর আদায় করার বিষয়টিকে তিনি কালো টাকা উদ্ধারের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছেন। বিদেশীদের অবৈধ লেনদেন রুখতে General Anti-Avoidance Rules (GAAR) আপাতত শিকেয় তুলে রেখেছেন।

বিরোধী দলের নেতাদের একথা মোটেই ভুললে চলবে না যে কংগ্রেস ও বন্ধু দলগুলো পশুখাদ্য থেকে দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের মতো জাতীয় প্রতিরক্ষার বিষয়েও দুর্নীতিতে যুক্ত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা কংগ্রেস সভাপতির কাছের লোক। তার পরিবারে এদের অবাধ গতিবিধি। কংগ্রেস পরিবারের সর্বশেষ কেলেঙ্কারিটির কুশীলব হলো অভিষেক ভার্মা ও সিদ্ধার্থ টাইটলার। অভিষেক ভার্মা হল প্রাক্তন কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ শ্রীকান্ত ভার্মার ছেলে আর সিদ্ধার্থ টাইটলার হল বর্তমানে কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও উড়িষ্যার পার্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত জগদীশ টাইটলারের ছেলে।

অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনাবেচায় দালালি করে আমেরিকার একটি ব্যাঙ্কে ২০৫ মিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন। এর আগেও তিনি একবার নৌবাহিনীর war room leak মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন এই বলে যে বহু স্পর্শকাতর প্রতিরক্ষা ডকুমেন্ট চুরি করে স্কর্পিয়ান সাবমেরিন প্রস্তুতকারক বিদেশী সংস্থা Thal-কে সরবরাহ করেছিল। সিদ্ধার্থ টাইটলার হলো তার ব্যবসায়িক সঙ্গী।

বিজেপি’র উচিত নয় কংগ্রেসের আর্থিক সংস্কারের নামে জাতীয় আর্থিক সংস্কারের গরম গরম বুলিতে অংশগ্রহণ করা। কারণ সংঘের স্বাধীন আত্মনির্ভর অর্থনীতির প্রবক্তা ঠেংড়িজীর দেখানো স্বপ্নে বিভোর একদল জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী মানুষ সাহসী, কুশলী ও নির্ভীক অটল বিহারী বাজপেয়ীর উত্তরসুরীদের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। জাতীয় অর্থনীতির ঘোরতর শত্রু আপাতমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর দৃশ্য দেখার জন্য নয়।

পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই

অবিনাশ রাই খান্না

পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর প্রায় সাড়ে ছয় দশক অতিক্রান্ত। অথচ পাকিস্তান সেদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমাজে অত্যন্ত প্রান্তিক স্তরেই ফেলে রেখেছে। ইন্টারনেট এবং তথ্য- প্রযুক্তির এই রমরমার যুগেও পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সেদেশে নাগরিক অধিকার, সম্মান, শান্তি-সমতা থেকে বঞ্চিত। যেখানে একটা শিশু বোরওয়েলে (কুয়ো) পড়ে গেলে TV ক্যামেরা ও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম লাগাতার ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইভ টেলিকাস্ট (সরাসরি সম্প্রচার) করে সেখানে পাক-হিন্দুদের বেলায় তার কিছুই হয় না।

১৯৪৭-এ সীমান্ত ভাগাভাগি হয়েছিল। আজও পাকিস্তানী হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ নয়। হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া এবং ধর্ষণ পাকিস্তানে রোজকার রুটিন মাফিক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ওই মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণ ও নিকাহ করছে স্থানীয় মুসলমানরা।

এবছরের মার্চ মাসের ঘটনা। পাকিস্তানী সুপ্রিম কোর্টও দুটি অপহৃতা নাবালিকা হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদেরকে ভয়াবহ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রিঙ্কল কুমারীকে মীরপুর এবং আশাকুমারীকে জ্যাকোবাবাদ থেকে অপহরণ করা হয়েছে। মাননীয় বিচারকরা হস্তক্ষেপ করতেই চাননি। ইউরোপীয়ান অরগানাইজেশন ফর পাকিস্তানী মাইনরিটিজ (EOPM) নামে একটি বেসরকারি সংস্থা, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চূড়ান্ত শোষণ করছে বলে জানিয়েছে। ই ও পি এম-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে—সেনারা সংখ্যালঘু (হিন্দু) মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে যৌন-ক্রীতদাসী করে রাখে। এমনকী

পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দুরা পাক-পাসপোর্ট হাতে।

পাকিস্তানের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার ২০১১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে স্বীকার করেছে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদ নয়। পুলিশ এসব দেখেও দেখে না, দুষ্কৃতীরা এটা জানে বলে আরও বেপরোয়া, তারা যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে। ২০১০ এর ১০ আগস্ট সিন্ধুপ্রদেশের মীরপুর খাস-এ পুলিশ হেফাজত থেকে একদল মুসলমান চারজন হিন্দু—মহাবৎ মল, পারো মল, কিরো মল এবং প্যায়ারা মলকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। তাদের আর কোনও উপায়ান্তর নেই—ভারতের দিকে করুণ চোখে দেখা ছাড়া। 'পাকিস্তান হিন্দু সেবা' নামে এক সামাজিক সংস্থা, যারা পাক-হিন্দুদের সহায়তার চেষ্টা করে থাকে, তাদের মতে গত দশমাসে চারশোর মতো হিন্দু পরিবার পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ভারতেই এসেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের হলো—ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একবারও পাকিস্তানের কাছে বিষয়টা তোলার অবকাশ হয়নি।

বছরের পর বছর, দশকের পর দশক যাবৎ পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুরা সপরিবারে ভারতে অনাদরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। তারা ভারতের নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন জানাচ্ছে, কিন্তু ভারত এব্যাপারে আইনকানুন খুবই কড়াকড়ি করছে। একরকম অসম্ভব তাদেরকে ভারতে মিলিয়ে নেওয়া। ওমলাল পিশোরি, তাঁর পরিবারের ছয়জন এবং অন্য ৩৫ জন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পাকিস্তান থেকে এসেছেন এবং পাঞ্জাবের খান্নায় আছেন। ১৩ বছর বাদেও তাঁরা যেখানে বাঁচার তাগিদে এসেছেন সেখানে তাঁরা বিদেশী। খান্নাতে আশ্রিত পাক-হিন্দুদের ভাগ্য ১৯৪৭-এ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৩৫০০ হিন্দু পরিবারের থেকে কোনও আলাদা নয়। ওঁরাও আজ অবধি ভারতীয় হননি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে। এতদিনে পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু পরিবারের সংখ্যাটা এক লক্ষে পৌঁছেছে। পাকিস্তানী হিন্দুদের বিষয়টা রাজনীতিতে অচ্ছুৎ, কেননা, তারা নির্বাচন জেতাতে পারেন না।

আশ্চর্যজনক হলো ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী 'হিন্দু'। তাদের একাংশের সমস্যা কারও সমস্যা নয়।

(লেখক : সাংসদ)

পাকিস্তানী হিন্দুদের দুর্দশা, পলায়ন অব্যাহত

বাসুদেব পাল

পুলিশী পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতিমাসে কমপক্ষে ২৫ জন হিন্দু যুবতী- কিশোরীকে অপহরণ, ধর্মান্তরকরণ এবং মুসলমান মতে নিকাহ্ করা হচ্ছে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে। শুধুমাত্র একটি প্রদেশেই এই অবস্থা----তাহলে অন্যত্র কী ঘটছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরও একটা তথ্য মনে রাখা দরকার যে, পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত যে স্বল্পসংখ্যক হিন্দু বসবাস করেন তাদের নব্বই শতাংশই সিন্ধুপ্রদেশে থাকেন। এখানে হিন্দু যুবতী মেয়েদেরকে আগে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তারপর ঘটছে অপহরণ, ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং নিকাহ্।

শাসক কর্তৃপক্ষের মদতে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য, জোর-জবরদস্তি টাকা আদায় যা আদতে জিজিয়া করের নামান্তর, ধর্মগতভাবে অত্যাচার, অবশিষ্ট হিন্দুদেরকে পাকিস্তান ছেড়ে আসতে বাধ্য করছে। এরা দেশভাগের সময়ে চূড়ান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সত্ত্বেও পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। ছয়দশক বাদে তাদের আর রেয়াত করা হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে এন ডি এ জমানায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীজী পাকিস্তানে সফরে গিয়ে জিন্নার মাজারে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। এর পরিণামে দলে এবং সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আদবানীজী

করাচীতে পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রতিবাদ 'আমরা কোথায় যাব'?

সমালোচিত হয়েছিলেন। সেইসময় শ্রীআদবানীজী বলেছিলেন, "জিন্না পাকিস্তান যাওয়ার আগে এক নৈশ ভোজসভায় সংবর্ধনার উত্তরে মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানে মুসলমানরা মসজিদে যাবে, হিন্দুরা মন্দিরে যাবে এবং খ্রিস্টানরা গীর্জায় যাবে। উপাসনার স্বাধীনতা থাকবে।" বাস্তবে যা আদৌ হয়নি।

নির্যাতীত, নিপীড়িত, চরম লাঞ্ছিত হিন্দুরা ভারতবর্ষে এসেও অকল্পনীয় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে প্রায় ভাষা হারিয়ে ফেলছে। ভারত সরকার পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদেরকে 'উদ্বাস্তু' হিসেবেও স্বীকার করতে রাজী নয়। গত বছরের ১ নভেম্বর এস সি আগরওয়াল নামে জনৈক 'তথ্য জানার অধিকার বিষয়ক কর্মী' সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দায়ের করে পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে—'এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' আর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও একই ভাষায় উত্তর দিয়েছে—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানে না কত হিন্দু পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছে।

এদিকে দিল্লীস্থিত 'আঞ্চলিক বিদেশী নিবন্ধীকরণ কার্যালয়' (FRRO) বলেছে— পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ২০০১-র মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গড়ে ৮ থেকে দশটি হিন্দু পরিবার প্রতিদিন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসছে। কিন্তু গত দশমাসে আরও ৪০০ পরিবার পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছে বলে জানা গেছে। এরা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষত রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাটে। ভারতে আসার ক্ষীণ স্রোত এখন খরস্রোতা নদীতে পরিণত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ১৫ শতাংশের মতো। বর্তমানে তা এক শতাংশেরও অনেক নীচে। যারা পেরেছে পালিয়ে এসেছে, অন্যদের হয় হত্যা করা হয়েছে নতুবা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। অনেক হিন্দুর মৃত্যুর পর অন্তিম সংস্কারও হয়নি।

৫৫ বছর বয়স্ক মেহের চাঁদ গতবছরের ২১ জানুয়ারি পাকিস্তানী হিন্দুদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। সমঝোতা এক্সপ্রেসে আসার সময়ে সঙ্গে এনেছেন ১৩৫টি প্লাস্টিকের জার। করাচীর শ্মশানক্ষেত্র থেকে মৃতদেহের চিতাভস্ম এনেছেন গঙ্গায় বিসর্জন দিতে।

মেহেরচাঁদ আর পাকিস্তানে ফিরে যাননি। দিল্লীর জাহাঙ্গীর -পুরীতে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা অন্য ২০০ জন হিন্দুর সঙ্গে মিশে থেকে গেছেন। করাচীতে যে উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন তা বলতে গিয়ে তার গলা ভারী হয়ে উঠে। তাঁর নিজের ভাষায়---- "২০০৯ সালে ক্যান্সারে আমার স্ত্রী মারা যান। আমার দুই মেয়ে। স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন সকালে দেখলাম আমার ১৬ বছরের মেয়ে অপহৃতা। খোঁজ করে জানলাম— একজন বয়স্ক মুসলমান গুণ্ডা তাকে ইলোপ করে নিয়ে গিয়েছে এবং রাতারাতি মুসলমান করাও হয়ে গিয়েছে। অনেককে ধরে মেয়ের দেখা পাওয়া গেল। শুধুই বোবা কান্না। অপহরণকারীদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী আছে। তারা রীতিমতো হুমকি দিয়েছে। আর স্থানীয় পুলিশ রাস্তাঘাটে আমাকে দেখে শুধু টিটকারি দিয়েছে।"

জাহাঙ্গীরপুরীতে উদ্বাস্তু শিবিরে পাকিস্তানের সিন্ধু, করাচী এবং হায়দরাবাদ থেকে আগত হিন্দুরা আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য স্থান থেকে আসা হিন্দুরা আশ্রয় নিয়েছে

পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসা আতঙ্কিত হিন্দুরা।

রাজস্থান এবং গুজরাটে। অনেকে ১৯৯০ সালে এসেছে। কিন্তু এখনও ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। নেই রেশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, গ্যাসের কানেকশন। অধিকার নেই সম্পত্তি কেনার, দেশের অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের—ভিসা ও পারমিটে যা লেখা আছে তার বাইরে কিছু করার। মেহেরচাঁদের আরও বক্তব্য---- 'আমার মতো হাজারে হাজারে পাকিস্তানী হিন্দু ভারতে পাকাপাকিভাবে আসতে চায় কিন্তু সীমান্ত বড় বাধা।' একটা ছোট্ট তাঁবুতে তিনটি পরিবার গাদাগাদি করে রয়েছে। চাঁদ করাচীতে ডাক্তার ছিলেন। ক্যাম্প এলাকার মধ্যেই তাঁর ছোট্ট একটি ক্লিনিক থাকলেও আয় আগেকার এক চতুর্থাংশও নয়। ক্যাম্পের অন্যদের বক্তব্য, চাঁদ মুখ খোলাতে পাক-হাইকমিশন থেকে তার বিপদের সমূহ সম্ভাবনা আছে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা ভারতের নাগরিকত্ব পাচ্ছি, ততদিন আমরা পাকিস্তানী নাগরিক। বার বার হাইকমিশনে যাতায়াত করতে হচ্ছে। আগে পাঁচবছরের জন্য পাসপোর্ট রিনিউ করানো যেত। এখন প্রতিবছরই করাতে হয়। হাইকমিশনে অনেক অবান্তর প্রশ্ন করা হয়। মেহেরচাঁদের মতো আরও অনেকেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে চায় মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে।

সিন্ধুপ্রদেশের ঘোটকীতে নিজের ঘরে বসে ৫২ বছর বয়স্ক কিশোরকুমার ভাবছেন—কবে মেয়েদের নিয়ে ভারতে পালিয়ে আসবেন। খুবই বিচলিত। সম্পদ তাঁকে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তিনটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির মালিক। দু'মেয়ে এক ছেলেকে নিয়ে ভারতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চার পুরুষের জন্মস্থান ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে। অথচ পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হচ্ছে। জন্মভূমিকে ভালোবাসলেও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ভারতে চলে আসতে চান।

বিশেষত কলেজপড়ুয়া দুই মেয়ের কথা ভেবে খুবই শঙ্কিত। কেউ কল্পনা করতে পারবেন না দুই যুবতী মেয়ের বাবা ওখানে সংখ্যালঘু হয়ে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে কী নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। পরিবারের নিরাপত্তা এবং বিশেষত মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর টাকা নিত্য নিয়মিত 'জিজিয়া কর' হিসেবে দিতে হচ্ছে। টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়া ফোন-কল আসছে নিয়মিত। এখন ভিসার আবেদন করে অপেক্ষারত। ভিসার আবেদন করে গত তিনবছর বসে আছেন—৩৮ বছর বয়স্ক ডাঃ অশোক কুমার কারমানি। সিন্ধুর মীরখাসের বাসিন্দা। ২০০৮-এর মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতও পাকিস্তানীদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে শুরু করেছে। 'ভিসা' দেওয়ার পদ্ধতি একটু সহজ হলেই সিন্ধুর অবশিষ্ট হিন্দুরা ভারতে চলে আসবে—এটা আক্ষরিক সত্য। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান কারমানি লিয়াকত মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছেন। করাচীতে তাদের যৌথ পরিবারের বিরাট বাংলোবাড়ি। স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে ভারতে আসার জন্য ভিসার অপেক্ষায় আছেন।

সিন্ধুপ্রদেশে ডজন ডজন হিন্দু অপহরণ ও জোর করে ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটছে। বিরাম নেই। প্রশাসন নির্বিকার।

সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এক সাঙ্ঘাতিক মন্তব্য করেছেন বলে খবরে প্রকাশ। তিনি বলেছেন---- "হিন্দুরা পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদে আর্থিক সাহায্য করছে।" করাচীর 'ডন' পত্রিকায় গত ১৮ মার্চ এই খবর বের হয়েছে। হতে পারে তিনি ভুল করে 'ভারত' না বলে 'হিন্দু' বলেছেন। কোটি কোটি পাকিস্তানীর মধ্যে মাত্র একজনের গলায় একটু ভিন্ন সুর শোনা গেছে। তিনি পাক রাষ্ট্রপতি আফিস আলি জারদারির বোন—ডঃ আজরা ফজল পেচ্চু। তিনি বলেছেন, "এটা সত্যি ঘটনা যে, হিন্দু মেয়েদের জোর করে মাদ্রাসায় আটকে রেখে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা চাই এরকম ঘটনা না ঘটে এবং এজন্য আইন করা হোক।"

পৃথিবীজুড়ে মানবাধিকার নিয়ে যারা মাথা ঘামান তাদের কাছে পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুরা ব্রাত্য। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও যারা গুজরাট নিয়ে জান লড়িয়ে দেন তারা এখানে নির্বাক, নিশ্চুপ। ভারতবর্ষের সংবাদমাধ্যম হিনা রব্বানির সৌন্দর্য্য নিয়ে মশগুল, হতভাগ্য হিন্দুদের বিষয়ে দেখার লেখার বা প্রশ্ন তোলার তাদের সময় কোথায়! ভারত সরকারেরও এনিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। শুধুমাত্র বিজেপি সম্প্রতি এনিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য স্পীকারের কাছে আবেদন করেছে বলে খবর। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা ইজ্জত বাঁচাতে চলে আসছে। চাপ পড়ছে ভারতের উপরে। পৃথিবীতে বোধকরি আর কোথাও এভাবে ব্যাপকহারে জনসংখ্যা কমেনি যতটা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে গত ৬৪ বছরে। আমেরিকার মাথাব্যথা শুধুমাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ, প্যালেস্টাইন ও জম্মুকাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য। সেক্যুলারইজমের ধ্বজাধারী দল ও নেতারা ভুলেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বিষয়টা তোলে না। যদি তাদের ইমেজ নষ্ট হয়—মুসলিম ভোট হাতছাড়া হয়!

পৃথিবীজুড়ে মানবাধিকার নিয়ে যারা মাথা ঘামান তাদের কাছে পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুরা ব্রাত্য। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও যারা গুজরাট নিয়ে জান লড়িয়ে দেন তারা এখানে নির্বাক, নিশ্চুপ।

নেত্রদান মহাদান

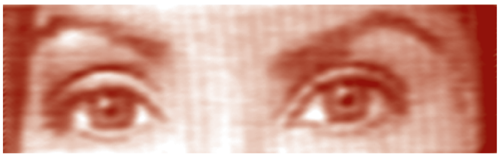

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature................ কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

এপার-ওপার, কোনও পারেই মানবিক ব্যবহার পাচ্ছেন না হিন্দুরা

নববিবাহিত রিঙ্কল ও তার মুসলমান স্বামী।

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইফতিকার মহম্মদ চৌধুরী নিজেই বলেছেন। —“১৯ বছরের হিন্দু যুবতী রিঙ্কল কুমারীকে নবীদ শাহ্ অপহরণ করেছে। রিঙ্কল তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে।”

হিন্দু মেয়েদেরকে জোরজবরদস্তি করে বন্দুকের মুখে অপহরণ পাকিস্তানে রোজদিনের ঘটনা। তারপর ধর্মান্তরকরণ এবং নিকাহ। তারা অসহায়। তাদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা রাজনৈতিক ক্ষমতাও নেই যে, তারা প্রশাসনকে চাপ দেবেন। রিঙ্কল এরই শিকার। আদালত চত্বর থেকে পুলিশ বোরখা পরা রিঙ্কলকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছে---- তাকে জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। রিঙ্কলের মায়ের নাম সুলক্ষ্মণা দেবী আর বাবা নন্দলাল। সিন্ধু প্রদেশের ছোট গ্রাম মীরপুর মঠেলা-য় তাদের বাসস্থান থেকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রিঙ্কল নিরুদ্দেশ হয়। কয়েক ঘণ্টা বাদেই তাদের গ্রাম থেকে বারো মাইল দূরের এক মৌলবী টেলিফোনে রিঙ্কলের মা-বাবাকে জানায় যে তাদের মেয়ে মুসলমান হতে চাইছে। এরকমই আশঙ্কা ছিল নন্দলাল আর সুলক্ষ্মণা দেবীর। তাঁরা ফোনেই ওই মৌলবীকে তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। ফোন কেটে যায়। কিন্তু সূর্যাস্তের আগেই রিঙ্কলের মুসলমান হওয়া আর নবীদ শা’র বিবি হওয়ার ঘটনা ঘটে যায়। হাওয়ার গতিতে খবর মীরপুর মঠেলা থেকে লাহোর, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ, ফয়জলাবাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা পত্রিকার পাতা ভরাতে থাকেন। কোনও লাভ হয়নি। হিন্দুরা বলতে থাকে রিঙ্কলকে জোরজবরদস্তি মুসলমান করা হয়েছে। প্রচণ্ড চাপ দিয়ে রিঙ্কলকে দিয়ে নিকার হলফনামা দায়ের করানো হয়। ক্ষমতাসীন দলের নেতা মিঞা মিঠঠির বন্দুকবাজ চ্যালারা রিঙ্কলকে ঘিরে দরগায় নিয়ে যায়। সবার প্রশ্ন, স্বেচ্ছায় মুসলমান হলে বন্দুকবাজেরা ঘিরে আছে কেন? ওই দরগায় গতবছর এভাবেই ২০০ জনকে মুসলমান করা হয়েছে।

একই রকম ঘটনা ঘটেছে ২৯ বছরের ডাঃ লতাকুমারীর ক্ষেত্রে। রিঙ্কলের ঘটনা আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমেরিকান সাংসদ ব্রেড কারমন গত ২৩ মার্চ পাক-রাষ্ট্রপতি জারদারিকে লেখা এক চিঠিতে সিন্ধুতে হিন্দুদের উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে একটিও শব্দ শোনা যায়নি।

১৯৯৮-এ পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে পালিয়ে ভারতের পাঞ্জাবে চলে এসেছেন পূজারীলাল। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের খান্নাতে এক ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করার পরেও মেলেনি ভারতীয় নাগরিকত্ব। তাঁর চৌদ্দ বছরের বোন অপহৃতা ও ধর্ষিতা হওয়ার পর আর পেশোয়ারে থাকার ভরসা পাননি। কোন না কোন অছিলায় তার নাগরিকত্বের আবেদনপত্র ফেরত আসছে। ইতিমধ্যে কুড়ি হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।

সিন্ধুপ্রদেশের মীরখাসের বাসিন্দা ডাঃ এ. কে. কারমানি। তিনবছর চেষ্টার পর ভিসা পেয়েছেন গত ফেব্রুয়ারিতে। গুজরাটের আমেদাবাদে আছেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে চলে এসেছেন পাকিস্তান থেকে।

পাঞ্জাবের খান্নাতে ১২০০ হিন্দু-শিখ পাকিস্তান থেকে এসে বনবাস করছেন। তেরো বছরের চেষ্টাতেও ভারতীয় নাগরিকত্ব মেলেনি। লালা মদনলাল ১৯৪৬-এ জন্মেছেন। ভারতের নাগরিকত্ব আইন অনুসারেই ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী। তবুও মেলেনি।

সিন্ধুর থরপারকর থেকে আগত পাকিস্তানী হিন্দুরা ডেরা গেড়েছেন রাজস্থানের যোধপুরে। এখানেই আছেন তুলসীদাস। তার কথায়, থরপারকর থেকে ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশন যেতে সময় লাগে সাতদিন, খরচ ৩০ হাজার টাকা। যা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। এসবই ভারতের স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রকের পাক-হিন্দুদের নিরুৎসাহ করার ব্যবস্থা।

যোধপুর শহরের বাইরে একটি তাঁবুতে অন্যদের সঙ্গে আছেন চল্লিশ বছরের যমুনা দেবী। ক্যাম্পে কোনও ব্যবস্থাই প্রায় নেই। অসুস্থ হলে হাসপাতালে গেলে তাদেরকে পাকিস্তানী বলে সরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা করতে চায় না। এমন ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুরা মর্মাহত।

চিঠিপত্র

'৭১-এর স্মৃতি

খুব সম্ভব ১৯৭১ সাল, মাস তারিখ মনে পড়ছে না। বেড়াতে গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে। তখন কোনও কোনও জায়গায় সামান্য গন্ডগোল চলছিল। একদিন সকাল বেলায়, আমি আমার ঠাকুরমার কোলে বসে আছি। এর মধ্যে কেমন যেন বিকট শব্দ শোনা গেল। শব্দটা হল -নারায়ে তকদির, আল্লা হো আকবর। মালাউন শেষ করো, মালাউন শেষ করো, মালাউনদের তাড়িয়ে দাও, লুঠ করো, খুন করো ইত্যাদি। দেখতে না দেখতে আমাদের বাড়ির পাশে কিছু মিঞা এসেছে। ওরা হলো আবুল, গোলাম, উমর, ছাত্তার আরও অনেকে, বাড়ি ঢুকেই গোয়াল থেকে গোরুগুলো খুলে নিয়ে যেতে লাগল। কেউ মোড়ার ধান নিচ্ছে, কেউ পাট নিচ্ছে, কেউ থালা বাসন নিচ্ছে। অর্থাৎ যার যা কিছু ইচ্ছা তাই করছে, আবার কেউ এসে বলছে, সোনা-চাঁদী গহনা কি আছে দে। তখন আমি আমার ঠাকুরমাকে বলি, ও ঠাম্মা এরা কি করছে, আমাদের বাড়ির সব কিছু এরা নিয়ে যাচ্ছে কেন? ঠাম্মা বলল, কথা বলিস না, লুঠ হচ্ছে। আমি বললাম, লুঠ কি? তখন ঠাম্মা বলছে, দেখ ওরা আমাদের সব জিনিসপত্র গায়ের জোরে নিয়ে যাচ্ছে, এটাই লুঠ। ওই সময়ের দৃশ্য, সব মিঞার হাতেই অস্ত্র, কারুর হাতেই রামদা, লাঠি, সড়কি, ভালা, তরোয়াল, ভোজালি ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। যা লুঠ করার সেটা হয়ে গেল, ভয়ে সব থর থর। এর মধ্যে গ্রামের মাতব্বর পুলিন সরকারের লোক দ্বারা খবর পেলাম, তোমরা সবাই রেডি হয়ে যাও। এখন আমাদের জীবন রক্ষার্থে ইন্ডিয়ায় চলে যেতে হবে। আমাদের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা সবাই দল বাঁধল। এবং পূর্ব দিকে হাঁটতে বলল। কারণ পশ্চিম দিকে নদী ও ফুলতলা বাজার, পাশে যশোর খুলনা রোড। সেখানে খান মিলিটারী টহল দিচ্ছে, এবং মাঝেমধ্যে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। গ্রামের সবাইকে ভিটে বাড়ি, অর্থসম্পদ, সব কিছু ত্যাগ করে জীবনটাকে বাঁচাবার জন্য ইন্ডিয়ায় রওনা দিতে হচ্ছে। কোনও মা-বোনেরা একটা ভাল কাপড়ও পরতে পারেনি। যে যেমন অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় দৌড়াতে শুরু করেছে। কেউ নিয়েছে ভাতের হাঁড়ি, কেউ নিয়েছে সামান্য থালা- বাসন, কেউ নিয়েছে ছেঁড়া-ভুড়া কাপড়। কেউ ছেলে-মেয়ে কোলে করে দৌড়াচ্ছে। কোনটা নিতে হবে, কোনটা নিতে হবে না এ বিচার কারুর মাথায় খেলছে না। সব লোক যেন উন্মাদ। ভয়ে থর থর, পাগলের মতো করছে। সেই সময়ের কথা মনে পড়লে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। দলপতি পুলিন সরকার আগে, পেছনে পেছনে গ্রামের সব লোক। সবার মনে একটাই প্রশ্ন— কোথায় যাচ্ছি, কি হবে, বেঁচে থাকতে পারবো কিনা। জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ভয়ে ভয়ে দৌড়তে হচ্ছে। সবার মধ্যে কেমন যেন একটা মৃত্যুর ভয়। কেউ কাঁদছে। কেউ অন্তরে অন্তরে কাঁদ কাঁদ ভাব নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কোনও কোনও বাড়িতে সকাল বেলা খাবার তৈরি হয়ে গেছে, কেউ খেতে পারিনি। সেই সকাল থেকে অন্ন জল কপালে জোটেনি। পুলিন সরকার আত্মীয়দের বলল, আমার লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। বলতে না বলতে খাওয়ার ব্যবস্থা হলো, সবাই ভয়ে ভয়ে খেল, পরের দিন আবার রওনা হলাম। এবার কোথাও কোথাও মানুষের লাশও দেখা যাচ্ছে। কোনও জায়গায় হয়ত কোনও বাগানের মধ্যে লুকোতে হচ্ছে। এরপর পুলিন সরকার বলল এবং রাত হলে কোথায় এক মাঠের মধ্যে রাত কাটাতে হবে। পুরুষেরা পাহারা দিতে লাগলেন। সবাই সামান্য কিছু খাওয়ার পর বিশ্রাম নিল। পুলিন বাবুর কাছে লাইসেন্সী বন্দুক ছিল, এবং উনি খুব সাহসী ছিলেন। সবাইকে বললেন, তোমরা ভয় পেও না আমি আছি। পরের দিন বিকালে বর্ডারের সীমানার আশেপাশে এলাম। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে খানসেনার গাড়ি। তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, সমানে গুলি চলছে, পুলিনবাবু বলল, সব উবু হয়ে শুয়ে পড়। এবং মনে হয় আমরা আর বাঁচতে পারবো না। সবাইকে মরতেই হবে। কারণ সামনে খান সেনা দেখেই এই কথা বলেছিল। কিছুক্ষণ পরে রোডে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই সময় রোড পার হলে একটু পরে দেখা গেল ইন্ডিয়ার সেনাদের। তখন সবার মনের মধ্যে সাহস এল এবং ইন্ডিয়ায় চলে এলাম। এবং যার যার ইচ্ছা মত জায়গায় চলে গেল।

সুহাস বসু, বেহালা, কলকাতা।

মক্কা : কিং কর্তব্য

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে লিখিত হয়েছে, "মক্কা-র কাবা মন্দিরে বহু দেবদেবী ও একটি কালো পাথর ছিল"। এই বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তথ্য জানার অধিকার আইনবলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্যাধিকারিকের সকাশে জানতে চাই, উদ্ধৃত বাক্যটির প্রামাণিক তথ্য কি? অতি সম্প্রতি স্কুল এডুকেশন বিভাগ (বিকাশ ভবন) আমার কাছে আটখানি প্রামাণিক তথ্য পাঠিয়েছে। যদি উক্ত বাক্যটি যথার্থ তবে তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা-র নমাজ গোল্লায় যায়। কুরান কথিত ইতিহাসে (ইব্রাহিম ও ইসমাইল নবী কর্তৃক মক্কা নির্মাণ ও হজ-এর জন্য আহ্বান) তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কুরান হয়ে যাচ্ছে শয়তানের পদাবলী। যদি মক্কায় বহু দেবতার মন্দির থেকে থাকে তো হজ অপবিত্র নাপাক বনে যাচ্ছে না কি? প্রসঙ্গতঃ বলতে দ্বিধা নেই, নবী মহম্মদ স্বয়ং মুসলমানদিগকেই প্রতারণা করেছেন। সেই সঙ্গে ভারতবাসী ও ভারত সরকারকেও প্রতারণা করেই চলেছেন। ফি বৎসর হজ অনুদান বাবদ অপচয় হচ্ছে সাড়ে সাতশো কোটি টাকা এবং এর সঙ্গে প্রত্যেক হজযাত্রীর খরচ যোগ করলে ভারতবাসীর অপচয় কয়েক হাজার কোটি টাকা।

আর্য তীর্থ মক্কাস্থ বহু দেব-দেবীর মন্দির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতাদেবীকে পত্র লিখেছিলাম গত ১৫-০৭-২০১১ ইং তারিখে। তিনি উক্ত পত্রের উত্তর পাঠাননি। কলকাতা হাইকোর্ট, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্রাসা (অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়), আলিগড়

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, জামা মসজিদ (দিল্লি), বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদ (ঢাকা), মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড (ঢাকা) প্রভৃতি স্থানে পত্র পাঠাই কিন্তু উত্তর পাইনি। আমার পত্রের উত্তর দেয়নি এশিয়াটিক সোসাইটি, ইতিহাস সংসদ, আইনমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ) এবং অন্যান্যরা। ধর্মের নামে দোহাই দিয়ে এবম্প্রকার লোক-তঞ্চকতা ও অর্থ অপচয় আমি মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। এখন কথা হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডুকেশন বিভাগ নিজে স্বীকার করছে, ওই মক্কা প্রথমে ছিল বহু দেবদেবীর মন্দির সে ক্ষেত্রে হজযাত্রা কি নিষিদ্ধ করার কোন পথ নেই? এই প্রসঙ্গে কি জনস্বার্থ মামলা করা যায়? আমি এই ব্যাপারে সমগ্র হিন্দু সমাজের কাছে পরামর্শ এবং সহযোগিতা চাই।

মৃণাল হোড়, চন্দননগর, হুগলী

ধর্ষণের ছায়া

শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। ভবিষ্যত নাগরিক গঠনের গুরু দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু যখন দেখি সেই শিক্ষক কন্যাসম ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন, তখন আঁতকে উঠি। আমরা কোন সমাজে বাস করছি! এদের কি সত্যি শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা আছে? এরা সমাজের কলঙ্ক। এদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা উচিত।

সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি গাজোল- ময়না হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে পড়ানোর নাম করে বাড়ি নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক ও তার এক বন্ধু মিলে ধর্ষণ করেন।

বিচারে ধর্ষণকারীর দশ বৎসর জেল ও দু'হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন মহামান্য আদালত। দু'হাজার টাকা বর্তমান যুগে সামান্য টাকা। যদি দু'লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করে ওই ছাত্রীকে দেওয়া হোত তবে, হয়তো তার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব হোত। বিচার ব্যবস্থার উপর কারও হাত নেই। আইনের শাসন মানতেই হবে। দেশে এই প্রথম ধর্ষণের ঘটনা নয়, বহু বছর পূর্বে খোদ রাজধানী দিল্লীতে মিলিটারি কর্নেলের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ ও হত্যা করার অপরাধে বিল্লা, রংগার ফাঁসি হয়েছিল। কলকাতায় একই অপরাধে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়। এ সব দেখে শুনেও সমাজে পরিবর্তন আসেনি, ধর্ষণকাণ্ড ক্রমাগত বেড়েই চলছে। অনেক রাজনৈতিক নেতা এ ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক রং চড়িয়ে ধর্ষণকারীকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। এদেরকে চিনে রাখতে হবে। ধর্ষণের একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত 'লিঙ্গচ্ছেদ'। তাহলে ধর্ষণকারী সারাজীবনের জন্য ''যৌনসুখ'' থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যেরা যখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করবে তখন ধর্ষণকারী তা দেখে অন্তর জ্বালায় জ্বলে মরবে। ধর্ষণকারীর পূর্ণ ছবি ও বিবরণসহ পত্র-পত্রিকা ও দূরদর্শনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা উচিত, যা দেখে ধর্ষণ করার পূর্বে অন্তত একবার ভাববে। এ ধরনের সাজাকে হয়তো অনেকেই অমানবিক বলবেন। কিন্তু ওই শিক্ষক যে অপকর্মটি করলেন তা কি মানবিক? সব জেনে শুনে কোনও ছেলে কি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজী হবে? এমন উদার মানসিকতার পরিচয় কোনও যুবক দিতে পারবে কী? ওই ছাত্রীটি সারাজীবন কলঙ্কজনক ঘটনা বয়ে বেড়াবেন! মেয়েটির মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ধরে নেওয়া যাক, কোনও যুবক সবকিছু জেনেই ওই মেয়েটিকে বিবাহ করলেন। তার সন্তান-সন্ততি যদি ভবিষ্যতে জানতে পারেন ওদের মা ধর্ষিতা হয়েছিলেন একজন শিক্ষকের দ্বারা, তাহলে সমগ্র শিক্ষক সমাজের প্রতি ওই ছেলেমেয়েদের ভক্তিশ্রদ্ধা কোনকালেই আসবে না। ধর্ষণের শাস্তির বিধান পরিবর্তন করা যায় কিনা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমাদের সংবিধানের অনেক ধারা সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় 'ধর্ষণের' সাজা 'লিঙ্গচ্ছেদ' বিধান আছে কিনা জানা নেই। এই ব্যবস্থা আইনে পরিণত করা যায় কিনা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আশা করি, পাঠক সমাজ আমার সঙ্গে একমত হবেন।

অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, নতুনপাড়া, কোচবিহার

'হিন্দু মোড়কে মুসলিম প্রতিবাদ'

সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যে মুসলিমপ্রীতি দেখা যাচ্ছে তা আর কতদিন ভারতের হিন্দুজনগণ নীরবে সহ্য করবে এই প্রশ্নটাই এখন বুদ্ধিজীবী সকল মানুষদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এমনকী কিছু উদারপন্থী মুসলিম জনগণও এই অযাচিত প্রীতিকে খুব একটা ভাল চোখে দেখছে না। কারণ এই প্রীতি সাময়িক। রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সহায়ক হলেও ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ রোপণ করবে তা এক বিরাট মহীরূপে যে পরিণত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

আর এটাও বলা যায় যে এটা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করবে। এটা স্পষ্ট। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে কোনও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভোট হয়তো করায়ত্ত করা সম্ভব কিন্তু তা কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। কারণ এই দেশে সংখ্যালঘু বলতে কেবলমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীকেই শুধু বুঝায় না। তারা ছাড়াও বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক এই দেশে বাস করেন।

আবহমানকাল থেকে এটা স্পষ্ট পরীক্ষিত হয়ে আসছে যে ইতিপূর্বে বহু জাতি এই দেশ আক্রমণ করেছিল ও তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সেই চেষ্টা সফল তো হয়ইনি। বরঞ্চ কালের বিবর্তনে সেই সব জাতি পরবর্তীকালে এদেশ হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আমাদের দেশের কৃষ্টির সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। অতএব আজ যারা সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চাইছে তাদের সেই উদ্দেশ্য কোনও দিনই পূর্ণ হবে না।

পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়েই শক্তি অর্জন ও সংরক্ষণ

'শক্তি সংরক্ষণ' শব্দদুটো তিনজনেরই খুব ভালো জানা। শক্তির অনেক রকম রূপ আছে। কোন ক্ষেত্রে কোন শক্তির প্রয়োজন —সেটা বুঝবার চেষ্টা করছে ভালোভাবে। যত বুঝবার চেষ্টা হয়েছে ততবারই শক্তির এক রূপ থেকে রূপান্তর লক্ষ্য করা গেছে। কিছু শক্তি জানা, চেনা, বোঝার মধ্যে থাকে। আবার কিছু শক্তি অদৃশ্য। অনুভব হয়তো করা যায়, কিন্তু দেখা মেলে না। সকাল থেকে সকাল যেভাবে আমাদের প্রতিদিন কাটে তার মধ্যে শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং ভূমিকা। কোনও কোনও শক্তি সহজে মেলে— খরচ হয় না কিছুই। আবার কোনও শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। আজ যে শক্তি সঞ্চিত হলো, তা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে আগামীদিনে। সব শক্তি ব্যয় করলে অসময়ের জন্যে কি থাকবে? পরামর্শ ছিল, শক্তি অর্জন আর সঞ্চয়ের সঙ্গে মন জড়িয়ে থাকে সবসময়—এটা মনে রাখতে হবে। কোন কোন শক্তি সামনে আসে? শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি, অর্থশক্তি---- এরকম ভাবে বিন্যাস করা যায় শক্তিগুলোকে। শক্তির বড়ো ক্ষেত্র যেমন রয়েছে, তেমনি ছোট ছোট জায়গা। আমাদের পরিচিত তিনজন শক্তি সংরক্ষণের কথা বলেছে অনেককে। গায়ের জোর নয়। অর্থের জোর নয়। মনের জোর। জীবনে এগোতে গেলে দেহের বল বা শক্তি চাই। দুর্বল মানুষ কিছুই করতে পারে না। টাকার জোর খুব বেশি না থাক, কিছুটা দরকার। তবে সব থেকে বেশি চাই মনের জোর। মনের জোর না থাকলে দেহের জোর বা টাকার জোরে কিছুই হবে না। আসলে প্রাজ্ঞজনেরা বলতে চেয়েছেন সব শক্তির ভারসাম্য চাই। গায়ের জোর যার খুব বেশি তার যদি বুদ্ধির জোর শূন্য হয় তাহলে অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াবে অনুমান করা যায়। আবার যে অর্থশক্তিতে বলীয়ান, সে তার অর্থদর্প এমনভাবে দেখাতে পারে যার দরুন দ্রুত সব উবে যেতে পারে। অর্থের জোর যার অহংকার বাড়ায় তার পতনে দেরি হয় না। ক্ষমতার জোর কবজা করা যায় টাকা বিলিয়ে কিছুদিনের জন্য। বরাবরের জন্যে নয়। টাকা জমিয়ে যদি তার সদ্ব্যয় হয় জনকল্যাণ কাজে তাহলে সেই অর্থশক্তি স্থায়ী মূল্য পায়। দেহের জোর কমতে থাকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। সেই শক্তি সংরক্ষণ সম্ভব নয়। দেহের জোরের অপব্যয় হলে দ্রুত জীবনে পূর্ণচ্ছেদ নামে। সময়মত না বুঝলে সমস্যা বৈকি।

সূর্য যে আলো দিচ্ছে তা বিপুল শক্তি। সেই শক্তি ব্যবহার করছি নানাভাবে। তার বিনিময়ে কিছু কি দিচ্ছি? কিছুই না। সেই শক্তির অপচয় করছি নানাভাবে। জল আরেক শক্তি। তা আমরা নষ্ট করে চলেছি এমনভাবে যার দরুন আগামীদিনে দেখা দেবে তীব্র জলসংকট। আমরা যথেচ্ছ গাছ কেটেছি। প্রকৃতির রাজ্যে ভারসাম্য রক্ষার যে নিয়ম রয়েছে তাতে বড় প্রয়োজন গাছের। সেই গাছকে আমরা যেমন খুশি কেটে নষ্ট করেছি। যতটা প্রয়োজন ছিল তার থেকে লোভ ছিল বেশি। শক্তি সংরক্ষণ এরকম অবস্থায় কীভাবে সম্ভব? প্রকৃতিপাঠ ঠিকমতো না হলে শক্তি সংরক্ষণে গোলমাল হয়ে যাবে। যাচ্ছেও।

শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপলব্ধি অত্যন্ত জরুরি— এটা আমাদের পরিচিত তিনজন সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। মনের জোরকেই তারা গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। কারণ আমাদের মন প্রতিকূল অবস্থার চাপে হারিয়ে যেতে চায় বারবার। সেই মনকে ফিরিয়ে এনে স্থির একমুখী রেখে এগিয়ে যাওয়াটাই আসল ব্যাপার। তাহলে বোঝা যাবে আমরা বৃহৎ শক্তির অন্তর্গত হয়েও কীভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এগিয়ে যেতে পারছি। নিজের ভিতরে শক্তি রয়েছে প্রত্যেকের। ঠিকমতো অনুশীলনে তা বাড়ে। আর সেই কল্যাণ শক্তি সম্পর্কে অনাগ্রহ থাকলে তা এগোয় না। কেমন এক নিস্পৃহ ভাব ছড়িয়ে পড়ে। এটা দুর্বলের লক্ষণ। শক্তির ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে দুর্বল। যে দুর্বল সে আক্রান্ত হতে পারে সহজেই। শারীরিক দুর্বলতার দরুন অসুখবিসুখ দেখা দেয়। অর্থনৈতিক দুর্বলতা তো লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখে। দুর্বল মানুষও জ্ঞান বিদ্যার নানাদিকে মনকে নিয়ে যেতে পারে না। জোর থেকেই জাগে কি অহংকার? মহাপ্রস্থানের পথের কথা মনে করুন। পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী এগিয়ে চলেছেন। একে একে দ্রৌপদী ও চার ভাইয়ের মৃত্যু ঘটল। জানা গেল পাণ্ডব ভ্রাতাদের পতনের কারণ তাদের মনের মধ্যে শক্তির দর্প ছিল। একেকজনের একেকরকম ক্ষমতা ছিল। এর থেকে বোঝা যায় কোন শক্তিই চরম বা চূড়ান্ত নয়। শক্তির অধিকারী যদি নম্র ধীর উদাত্ত না হন, বড় মনের পরিচয় দিতে না পারেন তাহলে শক্তি সঞ্চয় বৃথা হয়ে ওঠে। তিনজনের মনে শক্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন পাক খেতে থাকল। তারা একটা সিদ্ধান্ত পৌঁছোল, আমরা নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করি, শক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হই। বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞানের আলো আসে এক শক্তি নিয়ে। বলা হয়, মনের সব কটা জানালা খুলে দিলে আলো আসবে। মানসিক শক্তির সম্পদ ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এগিয়ে যাওয়ার কাজ সহজ হয়ে ওঠে। আর সেক্ষেত্রেও চাই বিনয়, ক্রমাগত জানার আগ্রহ। তবেই খুলে যাবে একটার পর একটা দরজা। শক্তির বিভিন্ন রূপকে বোঝা ও চেনার চেষ্টা চলতে থাকে বারবার। এক্ষেত্রে কোন সংহিতা বা বাঁধা সড়ক নেই। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়েই শক্তি অর্জন এবং সংরক্ষণ—এটা বলতে চাইলো তিনজন। গভীর বিশ্বাসেই অর্জন।

ঐতিহাসিক দুর্গ রণথম্ভোর

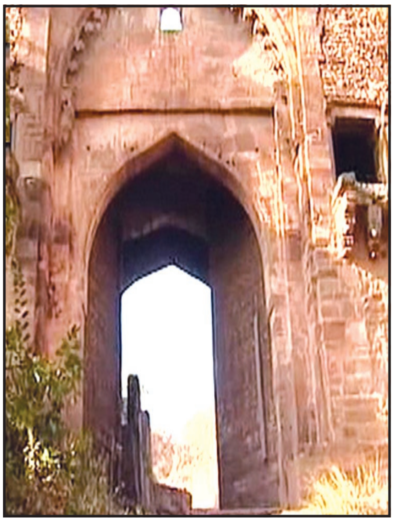

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

পশ্চিম ভারতের দুই আকাশচুম্বী পর্বত বিন্ধ্য ও আরাবল্লীর সংযোগস্থলে ঘন অরণ্য মাঝে অবস্থিত রণথম্ভোর দুর্গ রাজপুত শৌর্য ও বীর্যের গাঁথা উচ্চগরিমায় জগৎসমক্ষে উদ্‌ঘোষিত করছে। উচ্চ পর্বতশ্রেণী বেষ্টিত এই লৌহদৃঢ় দুর্গটির পরিধি প্রায় ৭ কিলোমিটার ব্যাপ্ত। এক চৌহান রাজপুত রাজা ৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের অন্যতম প্রাচীন এই দুর্গটি নির্মাণ করেন। দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সুগঠনের ফলে এটি শতাব্দী যাবৎ বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। চারিপাশের সুউচ্চ পর্বত সমূহ, তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত ও উঁচু-নিচু গভীর অরণ্য দুর্গের বাইরের প্রতিরোধ রূপে প্রতিভাত হোত। দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অতুলনীয় ছিল, ৭০০ ফুট উঁচু বুরুজ, অভেদ্য সুদৃঢ় প্রাচীর ও চারটি শক্তিশালী তীক্ষ্ণ খোঁটাযুক্ত তোরণ ইত্যাদি যেকোনও প্রকারের বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত কয়েকটি অট্টালিকা চৌহান রাজত্বের দক্ষ শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষী হয়ে কাল ও যুদ্ধের বিধ্বংসতা আত্মভূত করে আজও বিদ্যমান। যার মধ্যে অন্যতম বাদল মহল ও হামীরের দরবার ও রাজপ্রাসাদের কিছু অংশ যা চৌহ্বান রাজত্বের সমৃদ্ধি স্মরণ করায়। মন্দিয়ময় দুর্গচত্বরটির অন্যতম আকর্ষণ গণেশজীর প্রাচীন মন্দির, আজও সারাদেশ থেকে শ্রদ্ধাবান মানুষের ঢল নামে এই মন্দিরে। ১১৯২-এ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর চৌহ্বানদের মূল অবস্থান হয় রণথম্ভোর। তৎকালীন চৌহ্বানরাজ গোবিন্দ উদীয়মান শক্তিশালী তুর্কি সাম্রাজ্যের সাথে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে সুলতানী সামন্ত হিসাবে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। কিন্তু মহারাজ বীরনারায়ণের সময়ে দিল্লীর রণথম্ভোর সম্পর্কে পরিবর্তন আসে। সুলতান ইলতুৎমিস শঠতার আশ্রয় নিয়ে বীরনারায়ণকে হত্যা করে রণথম্ভোর দখল করে। বীরনারায়ণের কাকা ভাগবতজী ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পরই প্রবল বিক্রমে সুলতানী ফৌজকে পরাজিত করে দুর্গটি পুনর্দখল করেন। ভাগবতজী ও তার পুত্র জৈতা সিংহ দীর্ঘদিন ধরে দিল্লীর আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। এবং রণথম্ভোরকে শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৪৮ ও ১২৬৩ তে সুলতান বলবনের আক্রমণও বিফলে যায়। ১২৮৩ সালে পরাক্রমী হামীরদেব রণথম্বোরের সিংহাসন অলংকৃত করেন। মহান নরপতি হামীরদেব তার শাসনকালে দিগ্‌বিজয় যাত্রা আয়োজন করেন, রাজপুরোহিত বিশ্বরূপের তত্ত্বাবধানে অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন হয়। সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরব সূর্য পুনঃউদিত হয় রণথম্ভোরে হামীরদেবের রাজত্বে। হামীরদেবের পরাক্রমে শঙ্কিত দিল্লীর সুলতান জালালুদ্দিন খলজী বিশাল সৈন্যসহকারে ১২৯১-তে রণথম্ভোর অবরোধ করেন। কিন্তু হামীরদেবের নেতৃত্বে রাজপুত সৈন্যদলের রণসজ্জা, প্রস্তুতি এবং অভেদ্য দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দরুণ জালালুদ্দিন শীঘ্রই অবরোধ তুলে দিল্লী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। ১২৯৮-তে হামীরদেব কিছু মোঙ্গল বিদ্রোহীকে আশ্রয় দান করেন। তাকে এই কার্যের শাস্তি দিতে ও ভারতের অন্যতম অপরাজেয় দুর্গ দখলের লক্ষ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজী, তার দুই সেনাপতি উলুগ খান ও নুসরত খানের নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যবাহিনী রণথম্ভোর দখলের জন্য পাঠায়। সেনাপতি ভীমসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতরা অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে মুসলমান বাহিনীকে পশ্চাদসরণে বাধ্য করেন। সুলতানী সেনাপতি নুসরত খানের এই যুদ্ধে মৃত্যু হয়। এরপর আলাউদ্দিন নিজেই নেতৃত্ব করেন হতোদ্যম সুলতানী ফৌজের। এই অবরোধ দীর্ঘদিন চলে, সিংহবিক্রমে রাজপুতগণ পর্যদুস্ত করতে থাকেন মুসলমান আক্রমণ। সুলতান বিদ্রোহীদের প্রত্যর্পণের দাবী করলেও বীর ক্ষত্রিয় হামীরদেব শরণাগতদের আমরণ রক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে দুর্গের ভেতর খাদ্যশস্য হ্রাসের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই চরম মুহূর্তে দুই রাজপুত সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলমান ফৌজ দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। রাজকুমারী দেবলদেবী ও মহারাণী রঙ্গদেবীর নেতৃত্বে রাজপুতনন্দিনীগণ পবিত্র জৌহর ব্রতের আয়োজন করেন। যখন সেই বীর ক্ষত্রিয়াণীদের দেহের ছাই মাত্র অবশিষ্ট রইলো, বীর হামীরদেব তাঁদের অন্তিম সংস্কার সাধন করে অবশিষ্ট রাজপুতগণের সঙ্গে প্রবল পরাক্রমে শত্রুসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১০ জুলাই, ১৩০১-এ বীর বিক্রমে হামীরদেব বীরগতি প্রাপ্ত হন। রণথম্ভোর হয় মুসলমান অধিকৃত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেবার কুলতিলক মহারাণা কুম্ভ দুর্গটি পুনর্দখল করেন। মহারাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর, প্রথমে তার পুত্র বিক্রমজিৎ ও পরে বিক্রমজিতের মামা বুন্দীর সূর্জনহারার অধিকারে আসে রণথম্ভোর। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের রণথম্ভোর অবরোধ করলে সূর্জনহারা মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। অষ্টাদশ শতকে জয়পুরের মহারাজা সোয়াই মাধোসিংহ রণথম্ভোর দুর্গের অধিকার নেন এবং ১৭৬৩ সালে পুরো অঞ্চলটির নাম রাখেন "সোয়াই মাধোপুর"। ঊনবিংশ শতকে এটিকে জয়পুর রাজ্যের বন্দিদুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আজও রণথম্ভোর দুর্গ বীর চৌহান রাজপুতদের অনুপম শৌর্য ও চরম বলিদানের সাক্ষ্য হয়ে দণ্ডায়মান।

মন চল নিজ নিকেতনে

অর্ণব নাগ

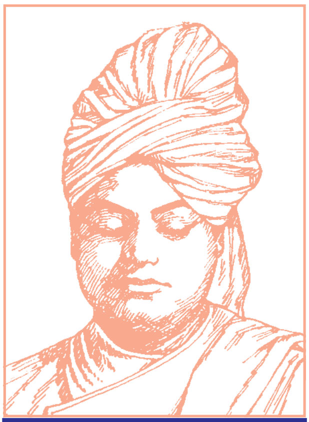

বঙ্গে বিবেক-তীর্থ

৭, রামতনু বসু লেনে রঘুমণি বসুর বাটী

স্বামী বিবেকানন্দের নিজের বাড়ি বলতে যে ৩ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের ভিটেবাড়িকে-ই বোঝায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কিনা মামারবাড়ির মজাটাই আলাদা। আর স্বামীজী'র ক্ষেত্রে মামারবাড়ি মামাহীন হলেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন দিদিমা রঘুমণি দেবী। নাতি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। বিবেকানন্দ জননী ভুবনেশ্বরী দেবীরও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আশ্রয়স্থল ছিলেন তাঁর এই মা রঘুমণি দেবী-ই। ১৯১১-র ২৫ জুলাই ভুবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যুর দু'দিনের মধ্যে ২৭ জুলাই মারা যান তিনি। সারাজীবন ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম চালানো মেয়ের পাশে সর্বদাই বিপত্তারিণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন এই অসাধারণ সুন্দরী মহিলা। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটের (অধুনা অভেদানন্দ রোড) ঘোষ পরিবারের গোপালচন্দ্র ঘোষ ও রাইমণি দেবীর একমাত্র কন্যা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল রামতনু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল বসুর সঙ্গে। বিবেক-জননী ভুবনেশ্বরীদেবী ছিলেন আবার নন্দলাল-রঘুমণির একমাত্র কন্যা। সেই সূত্রে রঘুমণি দেবীর ৭নং রামতনু বসু লেনস্থ বাড়িটিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন ভুবনেশ্বরী। এই বাড়িতে লোকজন ছিল কম। তাই হই-হট্টগোল কম, চিৎকার- চেঁচামেচিও কম। কিছুটা নির্জন ধরনের। ভবিষ্যত আধ্যাত্মিক নায়ক হিসেবে যে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা পাই, তার প্রস্তুতিপর্বে এই বাড়িটির অবদান ভোলার নয়। এখানে দোতলার একটি ঘর ছিল স্বামীজী'র নিজ নিকেতন, যাকে তিনি 'টঙ' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই টঙে রামকৃষ্ণদেবের বহুবার শুভাগমন হয়েছিল। সঙ্গীত সাধক নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গীত সাধনার তীর্থক্ষেত্র হিসেবেও এই টঙ-টি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার ছিল তাঁর আয়ত্তে, সেই জ্ঞানভাণ্ডার অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবেও এই টঙের অবদান কম নয়। কাম-কাঞ্চনত্যাগী ব্রহ্মচর্য পালনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন, তার প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসেবেও 'টঙে'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। নরেন্দ্রনাথ দত্তের কায়ার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ছায়া দেখানোর কৃতিত্ব রঘুমণি দেবীর ৭নং রামতনু বসু লেনস্থ গৃহের 'টঙ'টিকে দিতে বাধা নেই। এই সুযোগে জানিয়ে রাখি স্বামীজী'র গান শুনে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিস্থ হবার দেবদুর্লভ অপরূপ দৃশ্যেরও সাক্ষী এই 'টঙ'।

'টঙ'কে আরও কিছুটা মহিমান্বিত করতে সহায়ক হতে পারে বিবেকানন্দ-জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দের এই মূল্যবান লেখনীখানি, 'ভালবাসার টানে ও সদুপদেশ দানের প্রবল ইচ্ছায় ঠাকুর মাঝে মাঝে রামতনু বসু লেনস্থ নরেন্দ্রের টঙে আসিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গীত শুনিতেন, সাধনাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে তাঁহাকে উৎসাহিত করতেন।' (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড)। এই টঙের একটি সুখপাঠ্য বিবরণ পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের (স্বামীজী বলতেন প্রিয় সিঙ্গী) স্মৃতি কথায়, ''যে ঘরটি-তে (৭ রামতনু বসু লেনের) নরেন থাকেন, তা বার-বাড়ির দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই উঠিবার সিঁড়ি, বন্ধু-বান্ধবদের যাঁহার যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব ছোট-ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন 'টঙ'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, 'চল, টঙে যাই।' ঘরটি বড়ই ছোট— প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ছোট একটি বালিশ। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তানপুরা, তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখনও ওই মাদুরের ওপর পড়িয়া থাকে, কখনও বা খাটিয়ার নিচে, কখনও বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি থেলো হুঁকো, তাহার নিকট খানিকটা তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক, টিকে ও দেশলাই রাখিবার একখানি মৃৎপাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপরে, হেথা-সেথা ছড়ানো পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটানো, তাহাতে কাপড়, পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দু'টি ভাগ শিশিও রহিয়াছে, সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহারই নজির।'

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, 'আমার মাতামহীর ৭নং রামতনু বসু লেনস্থ বাড়িতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সাধুরা প্রায়ই যাতায়াত করতেন। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত (ঠাকুরের গৃহীশিষ্য ও সম্পর্কে স্বামীজী'র দাদু) ওই বাড়িতে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার সেখানে এসেছেন। পরে নরেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যও তিনি এখানে আসতেন।... রামচন্দ্রেরও পরে নরেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থায় সেখানে অবস্থানকালে, পরমহংস মশায় বহুবার এসেছেন এবং মাতামহী (রঘুমণি দেবী) ও প্রমাতামহীর (রাইমণি দেবী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।''

জীবনের শেষপ্রান্তে ভিটেবাড়ি সংক্রান্ত শরিকি মামলা মিটিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও দিদিমা রঘুমণি দেবী ও তাঁর ৭নং রামতনু বসু লেনের বাড়িটা ছিল বলেই মা ও ভাইবোনদের রেখে নিশ্চিন্তে যে চোখ বুজতে পেরেছিলেন বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী, আধুনিককালে শংকরের মতো গবেষকদের গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ভুবনেশ্বরী দৌহিত্র-বংশীয়রা এই বাড়িটি বিক্রি করে দেওয়ায় স্বামীজী'র স্মৃতি-বিজড়িত এই ঐতিহ্যশালী বাড়িটির যাবতীয় ঐতিহ্য ইতিহাসের কালগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

অন্যরকম গল্প

তিতিরদের বাগানে বুলবুলির বাসা

বাগানের পুব দিকে ছোট ছাতিম গাছের ডালে কদিন ধরে বুলবুলি পাখিরা বাসা করছিল। প্রথমে চোখে পড়ে তিতিরের। বাবাকে ডেকে বলল, ‘দেখো, ওরা আমাদের বাগানে ঘর তৈরি করছে।’ প্রণব কমপিউটারে কি কাজ করছিল। মেয়ের ডাক এড়াতে পারল না ‘পরে যাচ্ছি’ বলে। তিতির বারান্দা থেকে হাত তুলে দেখাল। পাখিরা উড়ে উড়ে আসছিল মুখে কাঠি নিয়ে। কেমন সুন্দর বানাচ্ছিল থাকার ঘর। প্রণব মেয়েকে বলল, ‘তুই দেখ। আমি ক্যামেরাটা আনি, ছবি তুলবো।’ বাবা ছবি তুলবে জেনে খুশি হলো তিতির। মা ডাকল, ‘তিতির চান করে নে। স্কুলে যেতে হবে।’ প্রণবও অফিসে বেরোবে।

স্কুল থেকে ফিরে তিতির বাগানের গাছটার দিকে তাকাল। তাদের ঘর তৈরি হয়ে গেছে। সারাক্ষণ তাকিয়ে দেখল। সন্ধের পর মায়ের কাছে পড়ার সময় বুলবুলির গল্প শুনেছে। আগে ঘুম পাড়ানোর সময় মা-মাসি-পিসিরা ছড়ার গান গাইত, ‘ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োলো/বর্গী এলো দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে/খাজনা দেবো কিসে?’ তিতির জানল আর খুশি হলো, মা-ও দেখেছে ভালো করে বুলবুলির বাসা বানানো।

কদিন বাদে দেখা গেলো ডিম পেড়েছে মা-বুলবুলি। পাহারা দিচ্ছে। অন্য পাখি কিংবা বিড়াল যাতে না আসতে পারে। কদিন বাদে ডিম থেকে বাচ্চা বুলবুলির মুখ দেখা গেল। তিতির খুব খুশি। বাবাকে দেখায়। তাদের ছবি তোলা হয়েছে। মাকে বারবার ডাকে, ‘এসো, এসো দেখে যাও।’

সেদিন বিকেলে বেশ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টিতে বুলবুলির বাসায় জল ঢুকে যাবে ভেবে তিতির একটা পলিথিনের টুকরো ছাতার মতো লাগাতে চেয়েছিল। বুলবুলিরা তিতির আর তার মা অঞ্জনাকে আপন ভাবে। প্রণবকে এখনও পছন্দ করে না। প্রণব বলল, ‘তুই বৃষ্টির মধ্যে ঢাকতে গেলি কেন? ওরা নিজেরাই ঢাকতে জানে, পারে।’ সেদিন প্রণব দেখল বাগানে একটা হনুমান এসেছে। পাখি দুটো সমানে হনুমানকে বিরক্ত করতে থাকল। যাতে সে বাগান থেকে চলে যায়। হনুমান বাসা ভেঙে দিতে পারে—এমন ভয় তো বুলবুলিদের ছিল। ভয় ছিল তিতির আর তার মায়েরও। তারপর বুলবুলির মা-বাবা বাচ্চাকে উড়তে শেখালো। দু-একবার পড়ে গেলো। তারপর উড়ল নিজে নিজে। এরপর একদিন বুলবুলিরা চলে গেলো বাগান ছেড়ে। খুব মন খারাপ তিতিরের। মা বলল, ‘ওরা আবার নিজের মতো চলে গেলো কোথাও।’ তিতির বাবাকে বলল, ‘তোমার তোলা ছবিগুলো প্রিনট্ করে সাজিয়ে রাখবো ঘরে।’ প্রণব আগেই ছবিগুলো প্রিনট্ করে এনেছিল। মেয়েকে দিল।

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

সমুদ্র উপকূলে তিমির দল

তিমির দেখা মেলে বিভিন্ন সমুদ্রে জাহাজে চড়ে যাওয়ার সময়ে। সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। তিমি নিয়ে অনেক গল্প আছে বিভিন্ন দেশে। সেগুলো পড়তে ভালোই লাগে। মানুষ অনেক সময় যা খুশি করেছে। তিমি মেরেছে। কখনও তা কোনও প্রয়োজনে ব্যবহার হয়েছে। কখনও হত্যা করার আনন্দে হত্যা করেছে। এর ফলে তিমির সংখ্যা কমে গেছে। যাঁরা সমুদ্রকে খুব ভালো চেনেন, জানেন, তাঁরা সবসময়েই চান সামুদ্রিক প্রাণীর যথাযথ সংরক্ষণ। মাছ পর্যাপ্ত থাকছে সমুদ্রে, তা ধরতে আপত্তি নেই। কিন্তু অনেক সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে দূষণে, যা মানুষের তৈরি। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে যথেচ্ছ প্রাণী হত্যা।

অনেক সময় তিমির দল সমুদ্রপথে জাহাজগুলোর দিক্‌নির্ণয়ে সাহায্যে করে। শুধু কম্পাসে বা আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে হয় না। কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের উত্তর সীমায় প্রায়

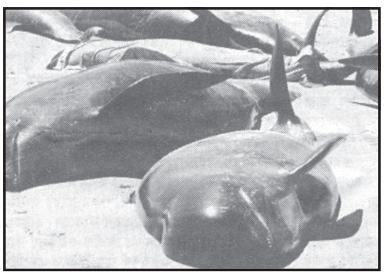

৯০টি তিমি দেখা গেল। কীভাবে তা নজরে পড়ে? এক বিমান চালক তা দেখেন। তিমি সংরক্ষণ কর্মীরা আছেন বিভিন্ন দেশে। তাঁরা তিমি নিয়ে নিবিড় চর্চা করেন। তিমিকে তাঁরা পরিবেশ-বন্ধু মনে করেন। সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তিমি কখনও জোয়ারের টানে এমন জায়গায় ঢুকে পড়ে যেখান থেকে জল নেমে গেলে তারা সমুদ্রের গভীর জলে ফিরতে পারে না। অন্যরকম পরিবেশে অস্বস্তি হয়। তখন একজায়গায় জড়ো হওয়ার ফলে দলে দলে মারা যায়। তিমি সংরক্ষণকর্মীরা উদ্যোগ নেন রক্ষার ব্যাপারে। তাঁরা ভাবছেন বারবার কেন তিমির দল উপকূলবর্তী অঞ্চলে দলে দলে হাজির হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। সমুদ্র -বিজ্ঞানীরাও থেমে নেই। কারণ খুঁজছেন তাঁরা। কারণ এরকম চলতে থাকলে সারা বছরে তিমির মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যাবে।

বার্তাবহ

পাতা চেনার ক্লাস

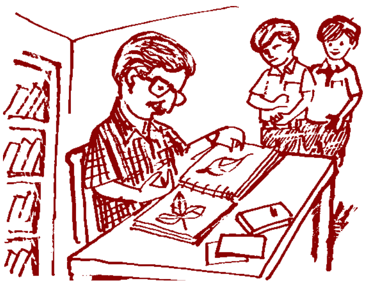

গাছের পাতা চেনা আর যত্নে রাখা

স্কুলে অজয়-স্যার বাংলা পড়ান। ছবি আঁকা শেখান। কোনদিন নিজের চেয়ারে বসেন না। দাঁড়িয়ে পড়ান। অনেক সময়েই ছাত্রদের মাঝখানে ঘুরে কার কী অসুবিধে হচ্ছে দেখেন। বুঝবার চেষ্টা করেন প্রত্যেকের মন। বাংলা পড়ানোর সময় অনেক গল্প করেন। ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে পড়ার বিষয়ের মধ্যে কখন ঢুকে পড়ে বুঝতে পারে না। স্যার নিজে বই থেকে পড়েন। কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি ছেলেদের বলেন, 'ভালো করে পড়লেই বোঝা যাবে।' কত চমৎকারভাবে ভাষা, বানান শিখিয়ে দেন।

ছবি আঁকার ক্লাসে মুখস্থ করে আঁকা পছন্দ করেন না। যেমন খুশি আঁকতে বলেন। দেখিয়ে দেন। খুব ছোটোরা রং করা পছন্দ করে বলে তাদের খাতায় এক একটা ছবি এঁকে রঙ করতে বলেন। কোন কোনদিন ফল-ফুল কিনে স্কুলে আসেন। আঁকার ক্লাসে তা ব্যবহার হয়। ক্লাস শেষে ফল-ফুল ছেলেদের দিয়ে দেন। অজয়-স্যার সেদিন বললেন, প্রত্যেকে একটা মোটা কাগজের খাতা করবে। তাতে বিভিন্ন গাছের পাতা রাখা হবে। কাঁচা পাতা কীভাবে শুকনো করে রাখা যায় তা শেখালেন। পাতার নিচে নাম লেখা হলো। এক পাতায় গাছের বিবরণ। কোনও কোনও ছাত্র বলেছিল, 'স্যার, ফল রাখা যাবে না?' অজয়-স্যার বলেছেন, 'ফল রাখা যাবে না। তবে কিছু ফলের খোসা রাখা যেতে পারে।' প্রত্যেকের খাতার বিবরণের ভাষা আলাদা। যে যার মতো করে লিখেছে। অজয়-স্যার বলেছেন, 'প্রত্যেকে নিজের খাতার যত্ন করবে।'

হেডস্যার বললেন, 'ওদের দিয়ে একটা বই করুন : আমাদের আশপাশের গাছ।' *বইমিত্র*

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের স্বরলিপি কোন বইয়ে আছে?

২. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের কে? তাঁর পিতামহের নাম?

৩. সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি কোন কোন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ?

৪. শান্তিনিকেতনে সংগীতবিভাগের বাড়ির নাম?

৫. সুচিত্রা মিত্র কার কন্যা?

উত্তর : ১. স্বরবিতান। ২. নাতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ। ৪. সংগীতভবন। ৫. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ছোটোদের বলছি

তোমাদের পাতা
নবাঙ্কুর।
কেমন লাগছে?
লেখা, আঁকা
পাঠাও।
নাম বয়স
স্কুলের নাম
অবশ্যই লিখবে।
ও
'সম্পাদক,
স্বস্তিকা'

উলটো পালটা

জগদীশ রায় নামকরা চিকিৎসক। ডাক্তারবাবুর কাছে সন্ধ্যেবেলা অনেকেই হাজির হন। কম পয়সায় চিকিৎসা করেন। কম ওষুধ খেতে বলেন। সেদিন তাঁর চেম্বারে বসেছিলেন পরিচিত একজন। নগেন ঘোষ। পেটের অসুখের জন্য যাওয়া। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিয়ে পাঁচটাকার ওষুধ খেতে বললেন। একই সময়ে দেখলেন ভোলা পাসোয়ানকে। তাকে বললেন, 'খুব সাবধানে থাকবেন। ওষুধ কিনে খাবেন।' নগেন দেখলেন প্রায় চারশো টাকার ওষুধ লিখে দিয়েছেন। নগেন জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, একই তো অসুখ ভোলার আর আমার—আমাকে পাঁচ টাকার ওষুধ দিলেন আর ওকে চারশো টাকার!'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওর আমার

ওপর বিশ্বাস নেই। টাকার ওপর অগাধ বিশ্বাস। প্রেসক্রিপশনে পাঁচ টাকার ওষুধ লিখলে ওর মনে হোত ডাক্তারবাবু দেখেননি ভালো করে। তোমাদের দুজনকে একই ওষুধ দিয়েছি অসুখের জন্যে। ভোলাকে টনিক-মনিক আগড়ম-বাগড়ম নানা জিনিস লিখে দিয়েছি। পয়সা হয়েছে এখন। কিনুক না।'

রামগরুড় সংকলিত

অঙ্গনা

শাড়ীর ক্রমবিবর্তন

কৃষ্ণকলি মুখার্জী

পোষাক পরিচ্ছদে পাশ্চাত্যের প্রভাব যতই প্রাধান্য বিস্তার করুক না কেন আজও শাড়ীর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। জিন্স-টপ-লেগিন্স-কুর্তী- কেপ্রি-সর্ট স্কার্ট-সালোয়ার কামিজের মতো হাল ফ্যাশানের পোশাকের যুগেও সর্বসেরা পোশাকের তকমা কিংবা শিরোপাটি শাড়ীরই প্রাপ্য। বাঙালী থেকে অবাঙালী, বিয়েবাড়ী থেকে পুজো বাড়ী—শাড়ী মানেই আভিজাত্যের সোনালী মোড়কে বনেদীয়ানার এক অপরূপ নিদর্শন। যদি বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটা হয় তাহলে শাড়ীর পরতে পরতে ধরা পড়বে ক্রমবিবর্তনের হাজারো ছাপ। প্রকৃতির নানারূপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে শাড়ীর শোভা। আধুনিক নারীর কাছে শাড়ীই শ্রেষ্ঠ ক্লাইমেটিক পোশাক। সরস্বতী পুজো কিংবা দুর্গাপুজোর আকর্ষণের প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এই শাড়ী। পাছাপেড়ে শাড়ী, কিংবা গ্রামবাংলার আটপৌরে শাড়ী, পূর্ববঙ্গীয় ঢাকাই কিংবা দক্ষিণ ভারতীয় কাঞ্জিভরম, উত্তর ভারতীয় জারদৌসি কিংবা ওড়িশার ইক্কত একই অঙ্গে হাজার এই রূপ সত্যিই মোহময়।

পুরাণে শোনা যায়, রাইকিশোরীর প্রিয় পোশাক ছিল নীলাম্বরী শাড়ী। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিসারের সময় এই নীলাম্বরী শাড়ীই রাধিকার রূপের বর্ণচ্ছটাকে আরও মধুর করে তুলত। অতীতের ইতিহাসে কিংবা বর্তমান সময়ের সর্বত্রই শাড়ীর চাহিদা বিদ্যমান। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে তাঁর সুদর্শন চক্রের মধ্যে দিয়ে শাড়ীর অস্তিত্বেরই প্রকাশ ঘটে। সময়ের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে শাড়ীর প্রস্তুতিকরণ, তার ব্যবহারে এসেছে নানা পরিবর্তন। স্বাধীনতার আগে মূলত তাঁত এবং ঢাকাই শাড়ীর চল বহুলাংশে জনপ্রিয় ছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় খদ্দরের পোশাকের সঙ্গে খদ্দরের শাড়ীর চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে শাড়ী পরার এক অভিনব মাত্রার প্রচলন ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই থেকে মহারাষ্ট্রীয় নারীদের মতো শাড়ী পরার যে চল ঠাকুরবাড়িতে এনেছিলেন, আজ বঙ্গনারীর অঙ্গে সেই চল-ই শোভা পাচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীর রূপেও নানান পার্থক্য বহিঃপ্রকাশিত হতে থাকে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য—ভারতের সর্বত্রই শাড়ী পড়ার ধরনের মধ্যেও নানান এক অদ্ভুত প্রাদেশিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে শাড়ীর সংজ্ঞা একটু অন্যরকম। আজকের যুগের নারীরা ঘরে বাইরে সমানভাবে ব্যস্ত। তাই অপেক্ষাকৃত ভারী সাবেকি শাড়ীর চাহিদা রোজকার দৈনন্দিন জীবনে একটু কমই চোখে পড়ে। তাই বস্ত্র প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রগুলি শাড়ী নিয়ে নানান গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছে। পাট এমনই একটি তন্তু যা এতদিন শুধুই কার্পেট শিল্পের মধ্যে কিংবা ঘর সাজানোর সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিগত চার-পাঁচ বছরে শাড়ী প্রস্তুতিতে পাট এক অভিনব মাত্রা এনেছে। সম্পূর্ণ পাট দিয়ে তৈরি শাড়ী কিংবা ঢাকাই এবং পাটের সংমিশ্রণে তৈরি শাড়ী উভয়ই সমান জনপ্রিয়। অনেক সময় দেখা যায় বেশ একটু পুরোনো শাড়ীর জমিটা নষ্ট হলেও তার পাড়ের ঔজ্জ্বল্য অমলিন। সেই সব শাড়ী থেকে পাড়গুলি সংরক্ষণ করে শুধুমাত্র সেই পাড়ের দ্বারা প্রস্তুত হচ্ছে অত্যাধুনিক শাড়ী। অনবদ্য সেই শাড়ীর সৌন্দর্য। শুধু নামী দামী প্রস্তুতকারক সংস্থাই নয়, এই শাড়ীর ব্যবসা বর্তমানে গৃহিণীদের কাছে স্বরোজগারের এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। সাদা কিংবা কোরা থানের ওপরে এপলিকের কাজ, ফেব্রিক প্রিন্ট-এর কাজ কিংবা সুতোর নজর কাড়া নক্সা দ্বারা প্রস্তুত শাড়ী আভিজাত্যের মান অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। সুতি, কোটা, সিফন প্রভৃতি শাড়ী সব ঋতুর পক্ষেই যেহেতু বিশেষ উপযোগী তাই এগুলির কদর সারা বছর ধরে চোখে পড়ার মতো।

বিয়ের সাজে শাড়ীই শেষ কথা। আগে আমরা কনের সাজে কাতান বেনারসীকেই বেশী প্রাধান্য দিতাম। কারণ তৎকালীন সময়ে সাবেকী শাড়ীর প্রচলনই বেশী ছিল, কিন্তু আজ আমরা কাতান বেনারসীর পাশাপাশি রাজস্থানী সিল্কের ওপর জারদৌসী বেনারসী, ঢাকাই শাড়ীতে বেনারসীর কাজ, টিসু বেনারসী প্রভৃতি উন্নতমানের শাড়ীকেও কনের সাজে সমাদর করে থাকি। এছাড়াও গাদোয়াল, কাঁথার স্টিচ, বোমকাই প্রভৃতি শাড়ী বিয়ের তত্ত্বকে সুসজ্জিত করতে সিদ্ধহস্ত। বর্ণাঢ্য শাড়ীর মেলায় বৃদ্ধি পায় রমণীর সৌন্দর্য। আর সেই সৌন্দর্য নির্মাণের মধ্য দিয়ে অনেক ঘরে জ্বলে ওঠে সার্বিক উন্নয়নের প্রজ্জ্বল দীপশিখা।

ছবিটি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর। বঙ্গললনাদের আধুনিক সজ্জায় শাড়ী পরা শিখিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির এই ঘরণীটি।

খোলা চিঠি

এক বছরেই ১০০ শতাংশ কাজ শেষ দিদি এবার ছুটি নিন প্লিজ

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এক বছরেই ১০০ শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলায় আপনাকে অভিনন্দন।

এবার তাহলে একটু ছুটি নিন দিদি। সেই ২০ মে থেকে এই ২০ মে যেভাবে ছুটতে ছুটতে কাজ করলেন তাত একটু বিশ্রাম দরকার। আমি আপনার শরীরের কথা ভেবেই বলছি। কিন্তু অনেকে বলছে, মানে নিন্দুকেরা বলছে, আপনি একটু বিশ্রাম নিলে সমাজটাও একটু বিশ্রাম নিতে পারে। রাজ্য একটু একটু হাঁফ ছাড়তে পারে।

দেখুন দিদি, লোকে বলছে, 'রেলে এবার মুকুল এসেছে, আম ভালই ফলবে।' আমি কিন্তু সেটা বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস রেল এখনও আপনিই চালান। মুকুল স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। (রেলের কি স্টিয়ারিং হয়! জানি না) সুতরাং একদিকে রেল একদিকে রাজ্য, দুই কাজ একসঙ্গে করা যার-তার কম্ম নয়। সেই সঙ্গে কেন্দ্রের সরকারটাও তো আপনিই চালাচ্ছেন। আপনি হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, আর না বললে না। সেকি চাট্টিখানি কথা!

এরই মধ্যে পাঁচ বছরের সরকার এক বছরেই সব কাজ করে ফেলেছে। ৩৪ বছর ধরে যা যা হয়নি তার সব হয়ে গেছে। টাকাপয়সা নেই তবু হয়ে গেছে। হ্যাঁ দিদি, এই হয়ে যাওয়াটা যারা ফিল করতে পারছে না তারাই নিন্দামন্দ করছে। সব কাজ দেখা যায় না। ফিল করতে হয়। এই যে যাঁরা গল্প কবিতা লেখেন-টেখেন তাঁরা কি সবকিছু দেখে তারপর লেখেন নাকি! তাঁরা ফিল করেন। কলকাতার গরমে বসেও বরফ ঢাকা কাশ্মীর নিয়ে দিব্যি গপ্প লেখা যায়। ভ্রমণকাহিনি তো ওভাবেই লেখা হয়। আসলে ফিলিংসটাই সব। গত একটি বছরে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি এবং কর্মসংস্থান হয়েছে। সেটা ফিল করুন। দিদি তো আর মিথ্যে বলেননি! কত পদ সৃষ্টি করেছেন! কত কত ব্যবসার পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করেছেন! এগুলো কি কাজ নয়? দিদির কাজ তো এইটুকুই। তিনি কি ব্যবসা করার মূলধন, চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাও হাতে হাতে দিয়ে আসবেন নাকি? ফিল করুন সেটা পেয়েছেন, দেখবেন কত ভাল লাগবে! মনে রাখবেন ঠিক ঠিক ফিল করা চাই। খালি পেটে যদি ভরা পেট ফিল করেন, দেখবেন ঢেঁকুর উঠবেই উঠবে।

সেই প্রথম দিন থেকেই তো দিদি আপনি বলছেন রাজ্যে ৩৪টা মাল্টি ফেসিলিটি হাসপাতাল হবে। তার মানেই তো হয়ে গেছে। রাজ্যের ৩৪১টা ব্লকে একটা করে কৃষক মান্ডি আর একটা করে কোল্ড স্টোরেজ হবে। তার মানেই তো হয়ে গেছে। নিন্দুকরা দয়া করে সেগুলো খুঁজবেন না। অনুভব করুন!

শিল্প-শিল্প করে কান্নাকাটি করবেন না প্লিজ। দিদি তো ছোটলোক নন যে, একেকবার একেক কথা বলবেন। তিনি ভদ্রলোক। বরাবর তিনি বলে আসছেন যে বিনিয়োগ আসছে। লগ্নি আসছে। দেশ বিদেশ থেকে শিল্পপতিরা প্লেনের টিকিট বুক করে রেখেছে। সেটা একবছর আগেও যেমন সত্যি কথা ছিল, এখনও তেমন সত্যি কথা। ভদ্দরলোকের এক কথা!

একজন কবি যদি বলতে পারেন, 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত' তা হলে আমাদের দিদিও বলতে পারেন, 'বিনিয়োগ আসুক বা না আসুক শিল্পায়ন কমপ্লিট।'

দিদি নেতাদের এটাই প্রচার করতে বলেছেন। গ্রামে, নগরে, গঞ্জে, হাটে বলতে হবে এক বছরে একশ কাজ কমপ্লিট। ফিল করুন। অনেকে আবার প্রশ্ন করছেন, কেউ যদি বলে কাজ হয়নি কথাশিল্প হয়েছে', তাহলে কী জবাব দেব? সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে, চুপ করুন। ৩৪ বছরের হিসেবটা দেখুন। দিদি, সত্যি আপনার এই অস্ত্রটা সুপার হিট। কেউ কিছু বললেই আপনার স্টাইলে খিঁচিয়ে উঠে বলতে হবে, ৩৪ বছরটা দেখুন। ৩৪ বনাম ১। ওদের টোটাল কাজকে ৩৪ দিয়ে ভাগ করে এক দিয়ে গুণ করুন। আচ্ছা গুণটা না করলেও চলবে। এবার পাশাপাশি ফেলুন। তাহলেই দেখবেন দিদির গুণ গাইতে হবে।

দিদি, আপনি এসব প্রচার করছেন বলে 'মিডিয়া সন্ত্রাস' শুরু হয়েছে। যারা এখনও আপনার বশ্যতা স্বীকার করেনি তারা প্রশ্ন তুলছে—একে হাঁড়ির হাল খারাপ, তার ওপর প্রচারের এত খরচে কী দরকার? আসলে দিদি, আপনার কাজের কজন এই সুযোগে কিছু কিছু ভাতা রোজগার করে ভাত জোটাবে সেটাতেই ওদের গাত্রদাহ। একদম কান দেবেন না দিদি। ঢাক পেটান। পিটিয়ে যান। ওরা বোঝে না, এতে রাজ্যেরই লাভ। কারণ, ক'দিন বাদেই পঞ্চায়েত ভোট। এই রাজ্যের ঐতিহ্য বলছে সরকার পক্ষ সরকারি খরচেই ভোট প্রচার করে। বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করুন দিদি।

দিদি, আমি আপনার হয়ে ওই সন্ত্রাসবাদী মিডিয়াদের বলছি, সরকারের হাঁড়ির হাল খারাপ বলে চেঁচাবেন না। নিজেদের হাঁড়ি সামলান। কারণ, মনে রাখবেন, এই রাজ্যে এখন দেশের মধ্যে সর্বাধিক মুসলমানের বাস। ক'দিন আগেই দিদি তাদের শান্ত রাখার জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ 'তোফা' ঘোষণা করেছেন ফুরফুরা শরিফে গিয়ে। যাঁরা মসজিদে আজান দেন তাঁদের এবং ইমামদের 'ইনাম' দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। সরকারের পকেট শূন্য বলে চেঁচালে ওঁরা ভাববে দিদি যা বলেছেন সবই 'টাকা ছাড়া ফাঁকা আওয়াজ'।

দিদি, সব শেষে আরও একবার বলছি, অনেক তো কাজ হোল। এবার একটু বিশ্রাম নিন। প্রতিশ্রুতির বন্যায় রাজ্যের বানভাসি দশা। তোষণের বন্যায় ভেসে গেছে মুসলমান সমাজও। এবার একটু ক্ষান্ত দিন প্লিজ।

চোখ বুজে উন্নয়নটা ফিল করি।

—সুন্দর মৌলিক

দিল্লীতে কোনও সরকার আছে কি?

অতিথি কলম

জয় দুবাসী

আমাদের প্রিয় বন্ধু, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর ২০১২-১৩ সালের পেশ করা বাজেট-টির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষটির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ই সমান নিস্তেজ, বেরঙ আর একেবারে মামুলি। অবশ্য বাজেটপিতাটিকে অন্য আর পাঁচটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকতে হয় যে বাজেট পেশের মতো এমন একটা নির্বোধ প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করার অবকাশ তাঁর নেই। আসলে বর্ষার রুটিন বৃষ্টির মতো বাজেট প্রতি বছর আসে যায়, পেছনে ফেলে যায় কিছু একঘেয়ে সংখ্যার বস্তা। এটি অনেকটাই থাওকো ধরে নিয়ে হিসেব করার প্রক্রিয়া। এই খাতের কিছু সংখ্যা ওই খাতে দাও, ওই খাত থেকে কিছু এই খাতে ঢোকাও, আবার বিভিন্ন খাতগুলোকে জুড়ে দাও—একটা গল্প দাঁড়িয়ে যাবে। ভাল করে দেখ বন্ধু, এটাই কিন্তু বাজেট।

দিল্লিতে এই সরকারকে চালাচ্ছে কে? এর চেয়েও সঠিক প্রশ্ন, সত্যিই কি দিল্লিতে সরকার নামে কোনও বস্তু আছে? সরকারের প্রধানমন্ত্রী কচ্চিৎ কদাচিৎ চাক্ষুস হন। লোকসভা চলাকালীন উপায়ন্তর না থাকায় মাঝে মাঝে তাঁকে মুখে কুলুপ আঁটা বুদ্ধমূর্তির মতো স্থানুবৎ বসে থাকতে দেখা যায়।

সত্যি কথা বলতে কী, ভারতের মাপের এমন বিশাল দেশে বাজেটের মতো বিপুল একটি পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া চালানোর মতো বুদ্ধিবৃত্তি এই সিং সরকারের নেই। যথার্থ দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যদি না থাকে তাহলে বাজেটও থাকবে না। অবশ্যই মুখার্জী মশাই-এর কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না, যা সরকারের অন্যান্য বাবুদেরও কারুরই নেই। তাই হয়তো বছর সালিয়ানা একটা বাজেট দিতে হয় তাই দেওয়া। যে কারণে তার না আছে কোনও বৈশিষ্ট্য, না কোনও দিক দর্শন, কেবল আটপৌরে আনা। যত তাড়াতাড়ি ভোলা যায় ততই মঙ্গল। এসব দেখেশুনে আমাদের প্রশ্ন করার সময় এসেছে, দিল্লিতে এই সরকারকে চালাচ্ছে কে? এর চেয়েও সঠিক প্রশ্ন, সত্যিই কি দিল্লিতে সরকার নামে কোনও বস্তু আছে? সরকারের প্রধানমন্ত্রী কচ্চিৎ কদাচিৎ চাক্ষুস হন। লোকসভা চলাকালীন উপায়ন্তর না থাকায় মাঝে মাঝে তাঁকে মুখে কুলুপ আঁটা বুদ্ধ মূর্তির মতো স্থানুবৎ বসে থাকতে দেখা যায়। কখনও বা দুরদর্শনেও তাঁর ঝটিতি দর্শন লভ্য। হয়তো বা তুরস্কের বা সোয়াজিল্যান্ডের কোনও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাঁকে দেখে বোঝা যায় না দেশগুলির ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল আছেন কিনা। অনেকটা মুড়ি-মিছরির এক দর। সকলের সঙ্গেই প্রায় একই চর্বিত চর্বণ।

অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য তুলনামূলকভাবে বাচাল সহকর্মীরা মাঝে মধ্যেই প্রকাশ্যে গলা ফাটান। তবে সরকার চালানোর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কেননা তাদের তেমন সময়ই নেই। আখেরে ফলদায়ী সব ক্রিয়াকর্মেই তাঁরা মশগুল। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই সব সতীর্থদের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ কিনা? তিনি কি ২-জি কেলেঙ্কারী প্রকাশ হওয়ার আগে কখনও দপ্তরের মন্ত্রী এ. রাজার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করে ছিলেন?

আবার দেখুন তাঁর বিদেশমন্ত্রীর কথা। অনেকদিন হলো তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু শুনতে পাই না। অবশ্য তিনি দেশে বিশেষ থাকেন না। বিদেশের জল হাওয়াই তাঁর বেশি খাপ খায়। অনেক সময়ই দেখা যায় তিনি মালডোভা থেকে মালদ্বীপে ছুটে বেড়াচ্ছেন। অবশ্যই যাত্রাপথে নিউইয়র্ক পড়া চাই তা সে যতই ঘুরপথ হোক না কেন। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে নিউদিল্লির থেকে নিউইয়র্ক অনেক বেশি রুচিকর জায়গা।

বাজেটগুলি ঃ

সেইজন্য মন কৌতুহলী হয়ে ওঠে— কে সরকারটাকে চালাচ্ছে? আমরা বলতে পারব না কেউ নয়, কেননা সরকার তো চলছে। আমরা তো বলতে পারব না মমতা ব্যানার্জী কলকাতার ট্রেন ধরার পর সেই অর্থে কোনও রেলমন্ত্রী ছিল না। কেন না ট্রেন তো চলছে! হয়তো সব সময় সময়ে নয়। সংসদে অবশ্যই একটি রেল বাজেট পেশ হয়েছিল। কিন্তু হায়, তার মধ্যেই মমতার বদলি ভদ্রলোক দলের সঙ্গে ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি করে তাঁকে রেল ভবন থেকে উচ্ছেদ করা হল।

রেল বাজেটের পরে পরেই নির্দিষ্ট অর্থমন্ত্রীই অর্থনৈতিক বাজেটটি পেশ করেন ও লোকসভায় প্রথামাফিক বাজেট পেশ থেকে বাজেট বক্তৃতার রীতি মান্য করেই কাজকর্ম চালান। দলিল-দস্তাবেজ, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কাগজপত্র সবই নিয়মমাফিক বিলি বন্টন করা

হয়। এসব দেখে শুনে মনে হবে সরকার তো চলছে। তবে একথাটাও মনে আসবে যে কেমনভাবে চলছে?

আউট সোর্স নয়তো?

লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে আজকাল অনেক এজেন্সি কাজ করছে যারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিলে অর্ডার মতো বাজেট সাপ্লাই দেয়। কিম্বা সরাসরি বিশ্বব্যাঙ্ক? তারা তো অনেককাল থেকেই আমাদের বাজেটের সারবস্তু কি হবে তা ঠিক করে দেয়। তাদের বললেই তো তারা এক পায়ে খাড়া হয়ে যাবে।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের যোজনা কমিশন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে আনা লোক দিয়ে ঠাসা হয়েছিল। তারাই আমাদের হয়ে আমাদের জন্য সব কাজকর্ম, পরিকল্পনা করে দিত। এর পরে হঠাৎই কাজটা আই এম এফ-এর ওপর বর্তায় (International Monetary Fund)। এই ফান্ডের লোক এখন যোজনা ভবনে বসেন। তাঁর হাত দিয়েই যাবতীয় অর্থনৈতিক পাঠ্যবস্তু জ্ঞানাগার থেকে বেরোয়। এর মধ্যে অবশ্যই আছে মহামূল্যবান অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Survey)। যদিও কেউই এটা পড়ে না।

এই সমীক্ষাটি বাজেটের মতোই ক্রমাগত পৃথুল থেকে পৃথুলতর হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আজকাল যে পরিমাণ তথ্য তালিকা পেশ করা হচ্ছে----যা অনেক সময়ই দিল্লির হাসপাতালগুলির আই সি ইউ বিভাগের তালিকাগুলোকেও হার মানাবে। তবে এটা ঠিক, কারুর অনিদ্রা রোগ থাকলে এই সমীক্ষা পাঠের উদ্যোগ তাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে সুনিদ্রা এনে দেবে। কথাটা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা আজকের জায়গায় যাবার আগে এই লিখনকর্ম তিনিই স্বয়ং করতেন।

আজকের মনমোহন

প্রধানমন্ত্রী আজকাল বাজেট নির্মাণে অংশ নেন না। তিনি অর্থনৈতিক সমীক্ষারও কারিগর নন। তাহলে তিনি আজকাল করেনটা কি? কেউ সেটা জানে বলে তো মনে হয় না। এই বছরের বাজেট দেখলে মনে হবে সেটি গত বছরের নকল। এটি যে গতবারের বাজেট দলিল থেকে ফটো কপি করা হয়েছে—সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাট রদবদল করা তো হয়েইছে। গত বছর পেট্রলের দাম বাড়েনি, এবার বাড়বে তবে বাজেটের পরে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন এই বাজেট অর্থনৈতিক উন্নয়নে মদত দেবে। এ বাণী তিনি গতবারেও দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী গত বছর অর্থমন্ত্রীর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছিলেন, এবারও দিলেন। রিপিট টেলিকাস্ট নতুনটা কি? বাজেট প্রকাশিত হয়েছে খবরটা একবার মিডিয়ার কানে গেলেই হলো। বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মিডিয়া। পত্রপাঠ তারা বর্ষাগমে হনুমানের মতো পাগলপারা হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই চ্যানেল থেকে ওই চ্যানেল আবার সেই চ্যানেলে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে তাদের ভাড়াটে বিশেষজ্ঞরা। যত্নে চর্বিত সেই একই বিশেষজ্ঞের বাণী তাঁরা অকাতরে আউড়ে চলেন যা অবশ্য তাঁরা আগের বছরেও উগরে ছিলেন।

এঁরা কিছুতেই বুঝতে চায় না যে ভারতবর্ষ এখন প্রায় আটকা পড়া অনেকটা অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। যে দেশে 'সরকার' আখ্যা পাওয়ার মতো সত্যিকারের সরকারই নেই। নেই কোনও অর্থমন্ত্রীও। দেশের অর্থনীতি তালগোল পাকিয়ে থেমে যাওয়ার জায়গায় চলে এসেছে। এ ব্যাপারে সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কেন নেই সেটাও পরিষ্কার। তারা জেনে গেছে আর বছর দুয়েকের মধ্যে তারা ক্ষমতা থেকে চলে যাবে। ঠিক যেমন গত ৩-৪ বছরে হওয়া নির্বাচনগুলিতে তারা বহু রাজ্য থেকেই বিতাড়িত হয়েছে।

আজকের সরকার ও রাজনীতিকরা

আমাদের একটা সরকার রয়েছে যেটি ইংরেজি ছোটহাতের 'g' দিয়ে শুরু। তেমনি বাজেটের ছোট হাতের 'b' দিয়ে (government & budget) শুরু। এই সরকারের আমলে সবই ছোট হয়ে যাচ্ছে। জিডিপি বৃদ্ধি থেকে চাকরি, রপ্তানী থেকে বিনিয়োগ, রোজগারের টাকার আসল বাজার দাম সবই নিম্নগামী। তবে হ্যাঁ, ফুলে উঠছে কেবল রাজনীতিকরা আর বাড়ছে তাদের লুটের মাল। খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রত্যেক রাজনীতিবিদই এমন কামিয়েছে যা অতীতে কখনও পারেনি। প্রায় সকলেই ক্রোড়পতি। প্রতি ২-৩ বছরের মধ্যেই তারা টাকা ডবল করে ফেলেছে যদিও তাদের আইনত আয় শুধুমাত্র মাইনের টাকাটি। তাহলে, কোথা থেকে এত টাকা আসে? আমরা উৎসুক ছিলাম অর্থমন্ত্রী হয়তো বা বিষয়টার ওপর বাজেটে তাঁর ভাবনার কথা জানাবেন। কিন্তু না, তেমনটা হলো না। তিনি নীরব থাকলেন। ভাবতে পারেন শাসক দলের এক রাজনীতিকের সম্পত্তির পরিমাণ ৪৫ হাজার কোটি টাকা! এই গৌরবে তিনি বিশ্বের ৫ জন অন্যতম ধনীর তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। এ ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেই চাইছে না।

সত্যিকার বাজেট

আমার মনে হয় বাজেট একটার বদলে দু'টো হওয়া উচিত। একটা আপনার-আমার মতো ছাপোষা লোকেদের জন্য। সামান্য টাকায় সংসার সামাল দিতে যাদের হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। আর একটি হবে বিশেষ করে তাঁদের যাঁরা সুইজারল্যান্ড আর কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে টাকার পাহাড় বাড়িয়ে চলেছে। আমি ওয়াশিংটন-সিঙ্গাপুরের কথায় যাচ্ছি না। সেখানে গুদামজাত অর্থের পরিমাণ আমাদের সকলের মিলিত সঞ্চয়কেও ছাপিয়ে যাবে। প্রণববাবুর বাজেটে এঁরা নিশ্চিন্ত। হায়! কারুর ঘাড়ে মাথা নেই এঁদের সঠিক আয়ের উৎস খোঁজে। সুইজারল্যান্ড গিয়ে এ বা বি-এর অ্যাকাউন্টে কত কত পবিত্র অর্থভাণ্ডার রয়েছে কে তা গোণার ঝক্কি নেবে। প্রণববাবুর মতো গোবেচারা লোক সে কাজ করতে যাবেনই না। তাঁকে যা করতে বলা হয় তিনি ততটুকুই করেন। হ্যাঁ, তাঁর মুখটি যত্নে সেলাই করে রাখেন। আর আমরা মূর্খের দল তাঁর করা বাজেটের সারবত্তা নিয়ে গলা ফাটাই। আরে এই বেচারা করবেনটা কি?

আমি তাই বাজেটের জন্য মিনিট পাঁচেক বরাদ্দ রেখেছিলাম। এটুকু সময়ই এর সঠিক পাওনা। শুধু শুধু সময় আপনি নষ্ট করবেন কেন? যখন আপনি জানেনই আসল টাকাটা কোথায়? আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সমীক্ষা, পর্যালোচনা এসবই লোকদেখানো হিসেব-নিকেশ। তাই একে নিয়ে এত হল্লা-গোল্লা, প্রতিক্রিয়া জানানো বাস্তবিকই নিরর্থক। আমার সন্দেহ মিথ্যে হোক, তবু না বলে পারছি না আমাদের অর্থমন্ত্রীই কি তাঁর উৎপাদিত সংখ্যাতত্ত্বগুলিতে নিজে আস্থা রাখেন যা নিয়ে লোকসভায় এত চুল ছেঁড়াছেড়ি হয়?

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও স্তম্ভ লেখক)

বাংলাদেশের আয়নায়

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার চর্চা?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি: ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সব বঙ্গসন্তান বাংলাদেশ সফরে আসেন তারা সবসময় কৃতার্থ বোধ করেন, উদ্বাহু হয়ে প্রশংসা করেন বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির চর্চা' ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা'র। বলতে দ্বিধা করেন না, বাংলাদেশের মতো অসাম্প্রদায়িক দেশ কোথাও তারা খুঁজে পান না। এমনকী ভারতবর্ষও এমন অসাম্প্রদায়িক নয়। সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৯০ সালে তৎকালীন সেনাপতি-রাষ্ট্রপতি হুসেন মুহম্মদ এরশাদ তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ঠেকাতে হিন্দুদের ওপর হামলার উস্কানি দেন। ৩০ ও ৩১ অক্টোবর পরিচালিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলায় বাংলাদেশে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরসহ প্রায় আড়াই হাজার মন্দির আক্রান্ত ও আগুনে ভস্মীভূত হয়, হামলা ও লুটপাটের শিকার হয় লাখ লাখ হিন্দু পরিবার, কয়েক হাজার হিন্দু মেয়ে ধর্ষিতা হয়। হামলায় সর্বস্ব হারিয়ে বহু পরিবার দেশত্যাগেও বাধ্য হয়।

(তথ্য : বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ।)

জ্যোতি বসু হামলার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির বলে উল্লেখ করে এক বিবৃতি দেন, সাম্প্রদায়িক হামলার খবর বানানো বলে বর্ণনা করেন। এরশাদ সাহেব বাংলাদেশে প্রতিটি কাগজে প্রথম পাতায় জ্যোতিবাবুর দেওয়া এই 'সার্টিফিকেট' ছাপতে বাধ্য করেন। পূর্ববর্তী সেনাপতি- রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সংবিধানের ইসলামিকরণ শুরু করেন সেই লক্ষ্যে। এরশাদ সাহেব বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ আরও পোক্ত করেন। রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করেন তিনি। অবশ্য গণআন্দোলনের তোড়ে শেষ পর্যন্ত ভেসে যান এরশাদ, ওই হামলার এক মাসের মধ্যেই। ঘটনাটার উল্লেখ করতে হলো কয়েকদিন আগে একটি সাক্ষাৎকার পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি নারায়ণ চন্দ্র শীলের এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে। শীলবাবু

এটাই কি বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িকতা?

যেসব বুদ্ধিজীবী ঢাকা আসেন তারাও বাংলাদেশের অ- সাম্প্রদায়িকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। প্রায় প্রতিদিন হামলা, হিন্দুদের বাড়িঘর জায়গা- জমি দখল, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, মূর্তি ভাঙচুর, মেয়েদের ধর্ষণ ও অপহরণের পর ধর্মান্তরিত করার ঘটনা চোখে পড়ে না। এদেশের সংবাদপত্রেই কিন্তু এসব খবর বেরোয়।

বাংলাদেশে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি এখানে যেভাবে দানা বাঁধছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক।' পশ্চিমবঙ্গের এক শীর্ষস্থানীয় কবি- সাহিত্যিক, যিনি আমন্ত্রণ নিয়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত ঘনঘন আসা-যাওয়া করেন, তিনিও ঢাকায় পথে-ঘাটে ধর্মনিরপেক্ষতা দেখতে পান। কোথাও সাম্প্রদায়িকতা দেখেন না। শুধু তিনি নন, আরও যেসব বুদ্ধিজীবী ঢাকা আসেন তারাও বাংলাদেশের অ- সাম্প্রদায়িকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। প্রায় প্রতিদিন হামলা, হিন্দুদের বাড়িঘর জায়গা- জমি দখল, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, মূর্তি ভাঙচুর, মেয়েদের ধর্ষণ ও অপহরণের পর ধর্মান্তরিত করার ঘটনা চোখে পড়ে না। এদেশের সংবাদপত্রেই কিন্তু এসব খবর বেরোয়।

আওয়ামি লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার এখন দেশ পরিচালনা করছে। সরকারে ভারতের সিপিআইএম-এর দোসর ওয়ার্কার্স পার্টি ও নকশাল বলে পরিচিত সাম্যবাদী দল যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা এরশাদ সাহেবের দল জাতীয় পার্টিও। কয়েক মাস আগে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের বাতিল করে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে দেশ পরিচালনার অন্যতম নীতি হিসেবে, কিন্তু তার পাশাপাশি এরশাদ সাহেবের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামও রয়েছে। একটা দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলে এবং বিসমিল্লাহ দিয়ে সংবিধান শুরু হলে ধর্মনিরপেক্ষতা কোথায় দাঁড়ায় তা নিয়ে বিতর্ক হয়নি তা নয়, কিছু বুদ্ধিজীবী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু কর্ণপাত করেনি আওয়ামি লীগ, মহাজোটের শরিক দলগুলোও। এ তথ্য নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বুদ্ধিজীবীরা পাননি।

যারা বাংলাদেশে এসে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা দেখতে পান তাদের জন্য হিন্দুদের সংখ্যা কিভাবে হ্রাস পেয়েছে তার পরিসংখ্যানটা তুলে ধরছি।

বছর	মুসলমান	হিন্দু
১৯৪১	৭০.৩%	২৮.০%
১৯৫১	৭৬.৯%	২২%
১৯৬১	৮০.৪%	১৮.৫%
১৯৭৪	৮৫.৪%	১৩.৫%
১৯৮১	৮৬.৭%	১২.১%
১৯৯১	৮৮.৩%	১০.৫%
২০০১	৮৯.৭%	৯.২%

[সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। এখানে শুধু মুসলমান ও হিন্দুদের পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। বাকিটা জনজাতি ও বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। ২০১১ সালে জনগণনা হয়েছে, যার তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি।]

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মনে করেন, যারা বাংলাদেশে সাহিত্যসভা কিংবা মানবাধিকার নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে যোগ দিতে আসেন তাদের কাছে এই পরিসংখ্যানটি থাকা দরকার। তাহলে প্রশ্নটা করতে পারেন, যেদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা হচ্ছে সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা কমছে কেন? পাশাপাশি পাকিস্তানের তথ্যটিও থাকা দরকার। কারণ বর্তমান বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানেরই অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুদের হার ছিল প্রায় ১৭ শতাংশ। কয়েক বছর আগের জনগণনা অনুযায়ী এই হার ২ শতাংশের নিচে। ১৭ থেকে ২ আর ২৮ থেকে ৯.২, ক্রমশ-নির্মূলের ধারায় তফাৎটা কী বড় রকমের কিছু?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes
Authrorised Distributor :
NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174
PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা
যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।
স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

নিরাপত্তার কপালে ভাঁজ

রহস্যময় ‘বহিরাগত’দের অবাধ আনাগোনা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নকশাল অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে ইদানীং ‘মঙ্গোলীয় গড়নে’র কিছু মানুষের আবির্ভাব হচ্ছে, যা রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অশনি সংকেত বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। গভীর জঙ্গলে নজরদারিও তত জোরদার করা যাচ্ছে না বলে প্রশাসনিক তরফে তাদের অসহায়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড সরকার মাও দমনে কড়া পদক্ষেপ নিতেই এই ঘটনা মাওবাদী কৌশলেরই অঙ্গীভূত কি না মূলত তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় ঝাড়খণ্ড পুলিশ। কারণ যে গহন জঙ্গলে এই ‘মঙ্গোলীয় আকৃতি’র লোকেরা ঘাঁটি গাড়ছে, সেই জঙ্গল পুলিশের কাছে দুর্বোধ্য হলেও তা হাতের তালুর মতোই চেনে মাওবাদীরা।

গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রের খবর, ১০০-র কাছাকাছি মণিপুরী বিদ্রোহীকে প্রশিক্ষিত করে ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে মাওবাদী গেরিলার ঢঙে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মণিপুরের পিপিল’স লিবারেশন আর্মি ও সিপিআই (মাওবাদী)-র মধ্যে ইদানীং কৌশলগত সমঝোতা হয়েছে। এদিকে উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো, নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-র সঙ্গে হাত মেলানোকে ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৃহত্তম বিপদ বলে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দু’পক্ষের এই সমঝোতার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে শীর্ষ নকশাল নেতা অমিত বাগচী ধরা পড়ার পর। অমিত এখন ভাইজাগ জেলে বন্দি। গ্রেপ্তারের আগে তিনি ঝাড়খণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। সি আর পি এফ সূত্রের খবর, উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহীদের লাতেহার ও পালামৌ-য়ের গহন অরণ্যে এখন প্রায়শ-ই দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বস্ত সূত্র জানাচ্ছে, সিপিআই (মাওবাদী) মণিপুরে লিবারেশন আর্মির স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিকে সম্মান জানাতে এবং বাকি ভারতবর্ষে পিপিল লিবারেশন আর্মির নকশালী দাবির প্রতি সহানুভূতি জানাতেই দু’পক্ষের সমঝোতা হয়।

সূত্রটি আরও জানাচ্ছে, লিবারেশন আর্মির প্রশিক্ষকরা তাদের মায়ানমার ক্যাম্প থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নকশালদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যার মধ্যে ঝাড়খণ্ডের সারেন্ডাও আছে। এমনকী নগদ অর্থের পরিবর্তে উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নকশালদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করছে। এদিকে লিবারেশন আর্মির গতিবিধি ও কার্যকলাপ থেকে পরিষ্কার যে তারা রাষ্ট্রবিরোধী মাওবাদীদের কৌশলে খুব সূক্ষ্মভাবে অংশ নিচ্ছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের মধ্যে মাও কার্যকলাপ ৯৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে সিপিআই (মাওবাদী) গোষ্ঠী। ইদানীং কেন্দ্র-রাজ্য—উভয় সরকারের কড়া মাও বিরোধী মনোভাবে এরা ব্যাকফুটে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাই এদের অক্সিজেন যোগাতে অস্ত্র সরবরাহ, কৌশলগত মানোন্নয়ন ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করাতে যেভাবে উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি উঠে পড়ে লেগেছে তাতে অচিরেই দেশ আরও বড় অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি হতে চলেছে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

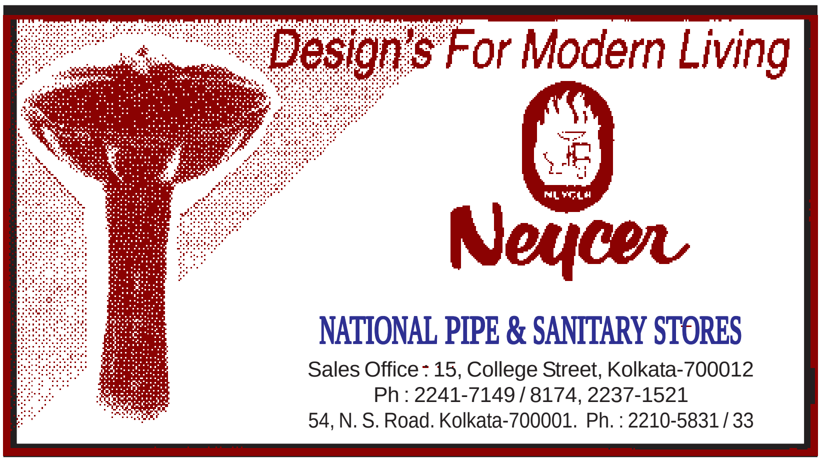

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি..

অন্য রকম

পূর্ণচন্দ্রন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৯৮-এর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। অকুস্থল উত্তর কেরলের কান্নুর জেলা। সিপিএমের বর্বর হামলার শিকার হয়েছিলেন বিজেপি'র কর্মীরা। তবে হয়েছিলেন আরও একজন। কোনওদিন রাজনীতির সাতে-পাঁচে যিনি থাকেননি। বয়স তখন ছিল মাত্র ন'বছর। সেই রাজনৈতিক দাঙ্গায় সে হারিয়েছিল বাঁ হাত, সঙ্গে ডান চোখের দৃষ্টিটাও। ছেলেটির নাম ছিল অমাবসী। অমাবসী'র জীবনে অমাবস্যা আনার মূলে ছিল স্টিলের কনটেনারে রাখা একটি বোমা। তা থেকেই জীবন প্রস্ফুটিত হবার মুখে দু'টি অমূল্য অঙ্গ খোয়ায় সে। অন্য কেউ হলে জীবনটা বোধহয় ওখানেই থেমে যেত। কিন্তু অমাবসী অন্যরকমের। গানের গলা ছিল ছেলেবেলা থেকেই চমৎকার। তার গানে মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষ মেলা ভার। বাঁহাত, ডান চোখ খুইয়েও গলাটাকে আগের মতোই সতেজ রেখে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সে। তবে সেই দৃষ্টি ছিল করুণা মেশানো। তা সে যখন এক লক্ষ টাকা সরকারি তরফে ক্ষতিপূরণ নিতেই যাক কিংবা তিরুবনন্তপুরমের এক অনাথআশ্রমে থাকার সুযোগ জোটাই হোক।

অনাথাশ্রমেও তার গানের প্রতিভা চাপা রইলো না। ইতিমধ্যেই তার জীবনে অমাবস্যার নিকষ কালো অন্ধকার যেন কেটে যায়, স্রেফ এই আশাতেই, তার নাম রাখা হয়েছিল পূর্ণচন্দ্রন। সত্যিই গলার যাদুতেই যেন তার জীবনে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হলো। নজরে পড়লো কেরলের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক পেরুমবাভোর জি রবীন্দ্রনাথের। তিন বছর ধরে তাঁর অধীনে সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ নিল সে। যার ফলশ্রুতিতে একটি রিয়েলিটি শো-য়ে যোগদান এবং তার সঙ্গীত প্রতিভার প্রতি ওই রিয়েলিটি শো-র বিচারকদের স্বীকৃতি দান। তার জন্মস্থান কোত্তায়ালের পুথুপল্লীতে স্থানীয় মানুষজনের কী আন্তরিক ভালবাসাই না সে পেয়েছিল গান শুনিয়ে, সেকথা বলতে গিয়ে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে তার। অমাবসী থুড়ি পূর্ণচন্দ্রনের কণ্ঠে মুগ্ধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চণ্ডী তাকে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২০০৮-এ উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ সমাপ্ত করে তিরুবনন্তপুরমে সরকারি মিউজিক কলেজে বি-এ নিয়ে ভর্তি হয় সে। এখন চূড়ান্ত বর্ষের প্রস্তুতি চলছে তার। সরকারি চাকরি পেয়ে যাওয়ায় পড়াশুনাটাকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পূর্ণচন্দ্রন। ভাল করে পড়াশুনো করে কেরাণীর চাকরি নয়, আরও বড় চাকরি করার স্বপ্ন দেখছে সে। বয়স তো মাত্র ২৩। সুতরাং সময় আছে। চলে গিয়েছে একটা হাত, একটা চোখ। তবুও উৎসাহ, উদ্দীপনায় অফুরান পূর্ণচন্দ্রন। অমাবস্যার অমানিশা কাটিয়ে পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ডানা মেলছে এক কিশোরের স্বপ্ন। যে স্বপ্নকে সার্থক করার দায়িত্ব এই সমাজেরই।

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন।

৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ে

মাত্র দুই মিনিটে ৈর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

রোগ থেকে মুক্তি

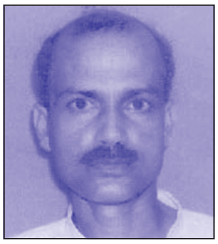

আশীষ পাল

কোমরে ব্যথা (লাম্বার স্পন্ডেলাইটিস)

কোমরে ব্যথা আজকাল সকলের মুখে শোনা যায়। সামনে ঝুঁকে যারা কাজ করেন, মাটিতে বসে, চেয়ার, টেবিলে বসে কাজ করেন, কম্পিউটারে কাজ করেন, মোটর সাইকেল চালান। এছাড়া মুটে অর্থাৎ যাঁরা ভারি ভারি জিনিস তোলেন তাঁদের এই ধরনের রোগ হয়। চলতি কথায় কোমরের ব্যথা বা কোমরের বাত বলে। এ ছাড়া কারো কারো হাড় বাড়ে, হাড়ের মাঝখানে ফাঁক কমে যায়, আবার হাড় জুড়ে যায়। এর ফলে কোমর থেকে পা পর্যন্ত সায়েটিকা নার্ভের ব্যথা হয়। এর জন্য উপযোগী কিছু আসন প্রত্যহ অভ্যাসের কারণে কোমরের ব্যথা নিরাময় হবে। প্রথম পর্যায়ে যে যে আসনগুলির উপর জোর দেবেন সেগুলি হলো —

উত্তান পাদাসন, মর্কটাসন, ভুজঙ্গাসন, শলভাসন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন—পবন মুক্তাসন, সেতুবন্ধন আসন, ষষ্ঠী আসন, বক্রাসন।

১. **উত্তান পাদাসন :** চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত শরীরের দু'পাশে রাখুন। পা দুটি জোড়া রেখে নিঃশ্বাস ভেতরে টেনে সোজা করে মাটি থেকে ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী ওপরে তুলুন। মনে মনে ১০ গোনা পর্যন্ত ফিরে আসার সময় ধীরে পা দুটিকে নীচে মাটির সঙ্গে রাখুন। এক ঝটকায় নামিয়ে আনবেন না। ৫ সেকেন্ড বিশ্রাম করে তার পর এই ক্রিয়া পুনরায় করুন। এইভাবে ৩-৬ বার করা। যে সকল ব্যক্তির কোমরে খুব বেশি যন্ত্রণা হতে থাকে তারা দুটি পা জোড়া না তুলে উপরের ছবির মত একটা পা তুলে আসনটি অভ্যাস করুন।

২. **মর্কটাসন :** চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটো কাঁধের সমান্তরাল দুই পাশে ছড়িয়ে দিন। হাতের দুই পাতা আকাশের দিকে রাখা। পা দুটোকে হাটু থেকে মুড়ে নিতম্বের কাছে আনুন। তারপর হাঁটু দুটোকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে ডান হাঁটুকে মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে দিন। বাঁ হাঁটু ডান হাঁটুর ওপরে থাকবে এবং ডান পায়ের গোড়ালির ওপরে বা পায়ের গোড়ালি থাকবে। ঘাড় বাঁ দিকে ঘুরিয়ে বাঁ হাতের তালুর উপর দৃষ্টি রাখুন। এই ক্রিয়া বাঁদিক থেকে করা। ৪ বার বাঁদিকে ৪ বার ডান দিকে করা।

৩. **ভুজঙ্গাসন :** উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। দেহের পেশীগুলি শিথিল করে দিন। হাতের পাতা দুটো মাটিতে কাঁধের নীচে থাকবে। ধীরে ধীরে ঠিক সাপের ফণার মতো মাথা এবং ধড়টিকে তুলুন। মেরুদণ্ড পিছন দিকে ঠেকবে। পা দুটি পিছনের দিকে টান করে দিন যাতে আঙুলগুলি মাটি স্পর্শ করে। এরকম করলে তবেই পিঠের ও ঘাড়ের পেশীতে টান পড়বে। তলপেটে চাপ অনুভব হবে। নিঃশ্বাস ধরে রাখুন। ৮-১০ সেকেন্ড মতো তারপর নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন। এই রূপ ৪-৬ বার করুন।

৪. **শলভাসন :** উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত উরুর নীচে লাগান। শ্বাস ভেতরে টেনে ডান পা কে ওপর দিকে তুলন সাধ্যমত। পা যেন হাঁটু থেকে না মোড়ে। থুতনি মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। ১০-৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকুন। ৬-৮ বার করুন। তারপর ছবির মতো বাঁ পাদিয়ে এই ক্রিয়া করা।

বি: দ্র:-যদি বেশি যন্ত্রণা না থাকে দুই পা এক সঙ্গে তুলে করা।

কম পক্ষে ২ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম। বিশেষ করে যে স্থানে ব্যথা সেখানে মনকে নিয়ে গিয়ে অ-উ-ম অর্থাৎ ওঁ-কার উচ্চারণ করতে করতে বিশ্রাম। উপরিউক্ত ক্রিয়া ৭-১৫ দিন করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন : চিৎ হয়ে শুয়ে ডান পায়ে হাঁটুকে বুকের ওপরে রাখা। দুটো হাতের আঙুলগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে ফাঁসিয়ে হাঁটুর ওপরে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাঁটুকে চাপ দিয়ে বুকের সঙ্গে লাগান এবং মাথা ওপরের দিকে তুলে হাঁটু দিয়ে নাক স্পর্শ করা। প্রায় ১০-২০ সেকেন্ড পর্যন্ত শ্বাস বন্ধ রেখে এই অবস্থায় থেকে তার পর পা পূর্বের অবস্থায় আনা (পা সোজা)। এই ভাবে ২-৪ বার করা। তারপর বাঁ পা দিয়ে করুন। শেষে দুটো পা দিয়ে এক সঙ্গে এই আসন করা উচিত।

বি: দ্র:-কোমরে যদি বেশী যন্ত্রণা থাকে তা হলে মাথা তুলে হাঁটু দিয়ে নাক স্পর্শ না করা। শুধু পা দুটোয় চাপ দিয়ে বুকের সঙ্গে স্পর্শ করুন।

সেতুবন্ধ আসন : চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুইটি হাঁটু ভাঙুন। কোমর এবং উরু উঁচুতে ওঠান। মাথার পিছন দিকটা ঘাড় এবং কাঁধ শক্ত করে মেঝেতে রাখুন। সাধারণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিন। এই অবস্থায় ৬-৮ সেকেন্ড থাকুন। তার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আসনটি করুন। প্রথম দিকে ৪ বার পরে ৬—৮ বার করুন।

ষষ্ঠী আসন : (পায়ের পাতা ভিতরে) চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলে এক হাতের বুড়ো আঙুল অপর হাতে গলিয়ে ধরতে হবে। এরপর দু'পায়ের পাতা দেহের ভিতর দিকে টেনে শরীরকে টান টান করতে হবে। একে যোগের ট্রাকশন বলে। স্বাভাবিক শ্বাসে দশ গোনা পর্যন্ত থেকে বিশ্রাম। এরূপ দুবার করতে হবে। উপরোক্ত কাজ উপুড় হয়ে করা।

বক্রাসন : দু'পা ছড়িয়ে বসতে হবে। দুহাত কাঁধ বরাবর তুলে সমান্তরাল পাশাপাশি রেখে একবার ডান দিকে দু হাত সহ মোচড় দেওয়া। দশ গোনা পর্যন্ত থেকে তারপর বাঁ দিকে মোচড় দিতে হবে। এই হলো একবার। শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এইরূপ দশবার করতে হবে। শেষে শবাসনে বিশ্রাম নিন।

ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজেশ্বরী মাতার পূজা

কৌশিক মল্লিক।। কলকাতায় বড়বাজার সুতাপট্টির সূত্র ব্যাবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত রাজরাজেশ্বরী মাতার আটদিন ব্যাপী ১৫৫তম বার্ষিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হলো বড়বাজারের ''বাবুলাল আগরওয়াল ধর্মশালা''র স্থায়ী পূজামণ্ডপে। দেবীর দশ মহাবিদ্যা রূপের অন্তর্গত, তৃতীয় রূপ যোড়শীই হলো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী রাজরাজেশ্বরী। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কতিপয় ব্যবসায়ী যে পূজার সূচনা করেছিলেন সেই পূজাই আজ সার্ধশতবর্ষ অতিক্রম করে নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাযথ বিধিবিধান মেনে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ইংরাজ শাসনকালে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে এই পূজার ইতিহাস গৌরবান্বিত হয়েছে। বৈশাখের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি (এই বছর ৪ মে হইতে ১১ মে ২০১২) পর্যন্ত আটদিন এই পূজানুষ্ঠান চলে।

'বাঁটুল দি গ্রেট' দাশুদা আর নেই

যৌবনে যাঁর শক্তিমান 'অতিমানবিক' চেহারা দেখে প্রতিবেশী শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ 'বাঁটুল দি গ্রেট' চরিত্র-চিত্রণ করেছিলেন, হাওড়া শিবপুরের সেই দাশরথি নাগ, সবার প্রিয় 'দাশুদা' ৮৪ বছর বয়সে প্রশস্ত কাঁধ, ৪৮ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ততোধিক প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে গত ২ মে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর প্রয়াত গোবর গুহর স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। শক্তির সঙ্গে সাহসও ছিল তাঁর প্রবল। '৪৬-এর দাঙ্গায় সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বিপন্ন হিন্দুদের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন, দাঙ্গাবাজদের প্রতিরোধে এমনকী অস্ত্র হাতে রাস্তায় নামতেও পিছপা হননি। সংঘবদ্ধ হিন্দু শক্তি নির্মাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা একদিন তাঁকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গেও যুক্ত করে। '৪৭ সালে গয়ায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গেও যোগ দেন। তারপর থেকে আজীবন স্বয়ংসেবক। একসময় শিবপুরে জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্রদের একটি অতি সাহসী ও সক্রিয় ছোট গোষ্ঠী ছিল, যারা আক্রমণ, হামলা চালিয়ে হিন্দু-বিরোধী শক্তি, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের অনেক কার্যকলাপই বানচাল করে দিত। 'দাশুদা' ছিলেন সেই গোষ্ঠীর একজন। যেখানেই স্বাস্থ্যচর্চা সেখানেই দাশুদা। কুস্তি, বক্সিং, লাঠি, ছুরি, তরোয়াল খেলা-সবেতেই ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। চাইতেন, স্বাস্থ্য-চেতনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে দৃঢ় চরিত্রসম্পন্ন ও নেশামুক্ত যুব সমাজ গড়ে তুলতে।

শুধু স্বাস্থ্য নয়, অসামান্য সাংস্কৃতিক প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন দাশুদা। বিশুর নাটক, যাত্রা ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষ্যপাঠেও ছিলেন অনন্য। কারও কাছে না শিখেও আড়বাঁশি ও মাউথ-অর্গান সুন্দর বাজাতে পারতেন। চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, মিঠু মুখার্জি, রবি ঘোষের মতো শিল্পীদের সঙ্গে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন।

দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে রেখে গেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ও পরে শ্রাদ্ধবাসরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদার, রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহু গুণমুগ্ধ উপস্থিত হন।

সমাবেশ সমাচার

সতীশচন্দ্র মাইকাপের জীবনাবসান

চলে গেলেন জাতীয় শিক্ষক, কলিকাতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন শিক্ষক ডঃ সতীশচন্দ্র মাইকাপ। গত ১২ এপ্রিল মধ্যরাতে তাঁর মৃত্যু হয়। গত ১৫ এপ্রিল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নেতাজী গবেষক, সমাজসেবী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাইকাপের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আত্মীয়স্বজন ও ছাত্রবৃন্দ। স্ত্রী, দুইকন্যা ও একপুত্র শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রবীন্দ্র আবির্ভাব সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমারোহ

সংস্কারভারতী আয়োজিত রবীন্দ্র আবির্ভাব সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমারোহ। কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে ২৫ বৈশাখের প্রাক্‌মুহূর্তে বিশ্বভারতীর লিপিকা সভাগৃহে 'কবিপ্রণাম' উৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

সংস্কার সর্বভারতীয় প্রথা অনুসারে ভাবসঙ্গীত এর মাধ্যমে উৎসবের শুভারম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রপৌত্র অধ্যাপক সুপ্রিয় ঠাকুরের মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে 'কবিপ্রণাম'-এর সূচনা হলো। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন উৎসবের প্রধান অতিথি রামবহাল তেওয়ারী, বিশেষ অতিথি নৃত্যগুরু কে জীতেন্দ্র সিং, উজ্জ্বল অতিথি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সিউড়ি শাখার সভানেত্রী লোকসম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী। আহ্বায়ক রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর পূর্বাঞ্চল সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য।

'কবিপ্রণাম' উৎসবের উদ্বোধক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, সংস্কার ভারতী সারাদেশ জুড়ে রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশতবর্ষে কবিপ্রণাম উৎসব করছে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমি চাই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রবীন্দ্র আদর্শ সকলের জীবনে প্রকাশিত হোক।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের ভাষণ গান কবিতার সম্মিলনে সঙ্গীত শ্রদ্ধার্ঘ্য— 'স্বদেশবন্দনা' দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন প্রবীর দাস।

সার্ধশতবর্ষে কবিগুরুর আত্মকথা-নৃত্য-গীত-কাব্য ও নাট্যাংশের এক অনবদ্য কোলাজ—'নহি সামান্যা নারী' অনুষ্ঠিত হয়। এটি কোনও মৌলিক সৃষ্টি নয়। এর সমস্তটুকুই রবীন্দ্রনাথের। দুটি সাংস্কৃতিক পর্বের সৃজনে সংস্কার ভারতী, সিউড়ি শাখা। সংকলন ও সম্পাদনা বিকাশ ভট্টাচার্য। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মৌমিতা বিষ্ণু। সামগ্রিক পরিচালনায় তিলক সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় নিবেদিতা লাহিড়ী। রাষ্ট্রবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মঙ্গলনিধি

গত ৪ মে কালিয়াগঞ্জ নিবাসী রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বিভাগ কার্যবাহিকা কৃষ্ণা বিশ্বাস তাঁর দুই পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দম্পতিদ্বয়ের মঙ্গল কামনায় সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্যের হাতে মঙ্গলনিধি রূপে ৪,০০০ টাকা সমর্পণ করেন।

লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলা

গত ৭ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬তম লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলার উদ্বোধন হলো কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ মঞ্চে। মেলাটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাজ্য আকাদেমির চেয়ারম্যান অধ্যাপক চিন্ময় গুহ।

এবার এই লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলা ২৬তম বছরে পদার্পণ করল। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির প্রচেষ্টায় দেশজ শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী মেলার ভাবনায় অনুপ্রাণিত এই মেলা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে শুরু হয়। এবছর পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে মোট পঞ্চাশজন লোকশিল্পী তাঁদের শিল্পকর্মের পসরা নিয়ে বসেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন কার্তিক চিত্রকর, পশ্চিম মেদিনীপুর (পটচিত্র); ঊর্মিলা দাস, বীরভূম (কাঁথা); অভিজিত ব্যাস, হাওড়া (বাটিকের কাজ); নেপাল চন্দ্র সূত্রধর, পুরুলিয়া (ছৌ-নাচের মুখোশ); সারজুমা বিবি, মুর্শিদাবাদ (পাটের কাজ); গৌরী মজুমদার, কলকাতা (পাটের ব্যাগ); রাধাগোবিন্দ মাইতি, পশ্চিম মেদিনীপুর (মোষের শিং-এর কাজ); মনোহর রক্ষিত, বাঁকুড়া (বালুচরী শাড়ি); অসিতবরণ জানা, পশ্চিম মেদিনীপুর (মাদুর); প্রদীপচন্দ্র ধর, কোচবিহার (শীতলপাটি); রতন বৈশ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর (বাঁশের মুখোশ); নেশব রায়, উত্তর দিনাজপুর (পোলিয়া মৃৎশিল্প); তপন কুমার গায়েন, বর্ধমান (খোদাই করা কাঠের কাজ); লক্ষ্মীরাণী দাস, মালদহ (বাঁশের কাজ); রাজেশ মাহাতো, বীরভূম (ডোকরার গহনা); অরবিন্দ দাস, বীরভূম (শোলার কাজ); রবি বিশ্বাস, নদীয়া (আলপনার কাজ)।

দিদির এক বছর

নটরাজ ভারতী

এক বছরে দিদি ফাটিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য এগোচ্ছে তরতর করে। তিনি ফুটছেনও। সব করা হয়ে গেছে। নতুন করে কিছু করার নেই। এবার কি দিদির বিশ্রামের সময়? এত কাজ করে দিদি কি হাঁপিয়ে উঠেছেন? এত কম সময়ে এত কাজ এর আগে কেউ করতে পারেনি। অবিশ্বাস্য। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এতটা আশা করেনি। আশাতীত সাফল্য। দিদি বলছেন। তার ভাইরা বলছে। পারিষদরা বলছে।

জঙ্গলমহল শান্ত। দিদি বলছেন, শুধু আগে যে নেতারা দু'জন পুলিশ নিয়ে ঘুরতো এখন তারা দশজন নিয়ে ঘোরে। সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোয় না। বাপকা বেটাদের যত আস্ফালন গলাবাজিতে। দিদির ভাইরা লড়ছে। মরছে। ওদের লড়তে দিন। মরতে দিন। দিদি বলছে এটা ওদের ঘরোয়া ব্যাপার। সুতরাং ওরা লড়বে এবং মরবে। হাওড়ায় মরবে, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমানে মরবে। কিছু বলা যাবে না। এটা ওদের ঘরের ব্যাপার।

পাহাড় শান্ত। দিদি বলেছেন। শুধু বলছেন না রীতিমতো গর্বিত। পচা ঘায়ের ব্যান্ডেজ খুলে গেলে দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায়। পাহাড়ের দগদগে ঘায়ের উপর চুক্তির সাদা ব্যান্ডেজ জড়িয়ে খুশিতে ছিলেন দিদি। এমন ভাব যেন বলছেন, কেমন দিলাম। প্রত্যাশার বেলুন চুপসে দিয়েছে মোর্চা নেতারা। জানিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ে যাওয়া চলবে না। ফের শুরু হয়েছে বনধ অবরোধ ধর্মঘট। কিন্তু আমরা বলবো, পাহাড় শান্ত। কারণ দিদি বলেছেন, "পাহাড়ে আগুন দেখলে আমরা বলবো এ আগুন উৎসবের আগুন। অথবা সাজানো ঘটনা।" দিদি ছুটছেন। মানুষ ছুটছে। একবছর আগে ক্ষমতায় আসার সময় দিদির ছিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। এক বছরে মানুষ হাওয়া। এখন সাধারণ মানুষের মতে মা-মাটি-মুসলমানের সরকার। সরকারি খরচায় ইমাম সম্মেলন। পৃথিবীর কোথাও হয়নি। শুধু পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। দিদি শুধু হিসাব দিয়ে চলেছেন। তার সিংহভাগ জুড়ে তিনি মুসলমানদের জন্য কি করেছেন তার ফিরিস্তি। ভুলেও হিন্দুদের নাম করেন না। কলকাতার বীরপুরুষ সাংবাদিকরা এনিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। কারো একথা বলার ক্ষমতা নেই যে, আপনি কি শুধু মুসলমানদের মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুদের জন্য কি কি করেছেন তার হিসাব কেউ চায় না। এতদিন দিদি ছিলেন মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। এখন দিদি মুসলমানের মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতার ধুরন্ধর বুদ্ধিজীবীরা মুখ লুকোবার জায়গা পাচ্ছেন না। দিদির হয়ে গলা ফাটিয়েছিলেন। বুকে পরিবর্তন চাই স্টিকার সেঁটে কলকাতার রাজপথে হেঁটেছিলেন। এদের অবস্থা সাপের ছুঁচো গেলার মতো নয়—বাঘের কচু গেলার মত। ব্রাত্য, অর্পিতা, শুভাপ্রসন্ন, অপর্ণা একেবারে সেঁটে গেছে। ফের রাস্তায় কৌশিক সেন, সুনন্দ সান্যাল। সাধারণ মানুষ দেখছেন। আর হাসছেন। এঁরাও জানেন বেশি বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কোনো না কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে দিদি জেলে ভরে দেবেন। হাতে গরম প্রমাণ দেবলীনা আর অভিরূপ। সঙ্গে পার্থসারথি।

দিদির ছায়াসঙ্গী ছিল দেবলীনা। সেই দেবলীনা এখন জেলে। ছত্রধরের আপাতত কোনও খবর নেই। কাল কেউটে ব্রাত্যর সব ফোঁসফোঁসানি শেষ। ফোঁসও নেই, বিষও নেই। সব আস্ফালন শেষ। মাত্র এক বছরেই। এখনও চার বছর বাকি। দুর্বুদ্ধিজীবীদের যাবতীয় বুদ্ধি এক জায়গায় করেও তার কোনও হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।

দিদি ছুটছেন। দুরন্তকে টেক্কা দিয়ে ছুটছেন। সঙ্গে ইমামরা। গ্রীষ্মের গরমে জ্বলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। দিদি অগ্নিকন্যা। কলকাতার প্রায় সব কাগজে সে কথা লিখেছিল। সেই আগুনেই এখন ঝলসে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। সাম্প্রদায়িকতার আগুন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আগুন। এত তীব্র আগুনেও দিদি নির্বিকার। মানুষ তাঁর সঙ্গে নেই। কিন্তু দিদি জানেন মুসলমানরা আছে। সুতরাং চলছে চলবে। পরিবর্তনের আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। তা যাক। দিদি ছুটছেন।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

খেলা

কলকাতাতেই আটকে রইল ইস্টবেঙ্গল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত কলকাতা ফুটবল লিগ ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে এল। আর তাতেই খুশিতে ডগমগ লাল-হলুদ সদস্য- সমর্থকরা। লিগের শেষ ম্যাচে মহামেডানকে দুরমুস করে ৬-০ গোলে হারিয়ে লিগ খেতাব জেতার সঙ্গে সঙ্গে যুবভারতী জুড়ে বহ্নিশিখা। কয়েকহাজার সমর্থকের ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচ দেখলে কে বলবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গোয়ার দলগুলোর আধিপত্যের সামনে নতজানু ইস্টবেঙ্গল! সাম্প্রতিক এএফসি জোনাল রাউন্ডের

মর্গ্যান

খেলায় মধ্যপ্রাচ্যের দলগুলির বিরুদ্ধে হেরে ভূত হতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। একটা ম্যাচ নিদেনপক্ষে ড্র করাও সম্ভব হয়নি।

আসলে কলকাতার ক্লাব কর্তা থেকে সদস্য সমর্থক প্রত্যেকের দৃষ্টি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের কর্তা, খেলোয়াড়, সমর্থকরা চান তাদের প্রিয় ক্লাবটি যেন চির প্রতিপক্ষকে হারায়। খেলায় মুম্বাই, গোয়া, কেরলের দলগুলি জাতীয় লিগ বা ফেডারেশন কাপ নিয়ে থাকে। দুই চিরপ্রতিপক্ষের ম্যাচে জয়-পরাজয়টাই সারা বছরের বিবেচ্য বিষয়। তাই

টোলগে

বছরের পর বছর জাতীয় লিগ চলে যাচ্ছে গোয়ায়। আর ইস্টবেঙ্গল তবু মন্দের ভাল। পরপর দুরমুস হয়ে খানিকটা মুখরক্ষা করেছে। এছাড়া বিগত কয়েক বছরে সাফল্য এসেছে ফেডারেশনেও। কিন্তু মোহনবাগানের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। জাতীয় লিগে ৭/৮ নম্বরে শেষ করা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির। একমাত্র সাফল্য গতবছরে ফেড কাপ জয়।

বছরের পর বছর কলকাতা তিন প্রধানের কর্তারা বিশাল বাজেটের টিম গড়েও প্রত্যাশিত সাফল্য পাচ্ছেন না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে প্রথমেই উঠে আসবে তিন প্রধান দলের কেউই জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। যদিও জাতীয় লিগকে টার্গেট করে দল গড়া হয় কিন্তু জাতীয় লিগ না এলেও ততটা হা-হুতাশ শোনা যায় না। নিজেদের মধ্যে খেলায় জিততে পারলে ষোলোকলা পূর্ণ। এই চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মোহন-ইস্ট কর্তাদের। এখন অবশ্য মহামেডান আর তৃতীয় প্রধান নয়। তার জায়গা নিয়েছে প্রয়াগ ইউনাইটেড। একদা চিরাগ বর্তমানে প্রয়াগ, ধীরে ধীরে সর্বভারতীয় অঙ্গনে নিজের উজ্জ্বল অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। অথচ এই ইস্টবেঙ্গল কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ার মাটি থেকে আশিয়ান কাপ জয় করে এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বুকে আধিপত্য নিয়ে খেলে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের সেরা ক্লাবদলগুলিকে জমি ধরিয়ে দিয়েছিল। আগে বলা হোত বিদেশী দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জ্বলে ওঠে এবং ভারতের সম্মান-মর্যাদা রক্ষায় কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করে। ডক রোগ্যাঙ, লিয়ং-ইয়ং, পাস ও তাজক্লাবের মতো অনেক শক্তিশালী দলও ইস্টবেঙ্গলের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৯৩ যে যুব ভারতীতে ইরানের আল-জাওরা ক্লাবের মতো উন্নত দলও এই ইস্টবেঙ্গলের কাছে একপ্রকার আত্মসমর্পণ করেছিল। তারপর কাঠমাণ্ডুতে ওয়াই-ওয়াই কাপ ও জাকার্তায় আশিয়ান কাপ জয় তো এশিয়ান ফুটবলে অন্যমাত্রার সঞ্চার করেছিল। কোথায় গেল সেসব অদম্য মূল্যবোধ যা ইস্টবেঙ্গলকে দেশের ছাড়িয়ে দুর্ভেদ্য বিদেশেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে?

ইদানীং প্রত্যেকবছরে এএফসি কাপে ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতা ও চিন্তা-চেতনার দৈন্যতা দেখে প্রকৃত দেশপ্রেমিক সমর্থকদের বুকে বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এরা যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ইস্টবেঙ্গলকে বিচার করতে অভ্যস্ত। খেলোয়াড়রা প্রচুর অর্থ পাচ্ছেন, ক্লাবে আধুনিক জিমনাসিয়াম হয়েছে, জাকুঁজি বসেছে, এসেছে টিমবাসও। খুব শিগগিরই নিজস্ব ফুটবল হাউসও তৈরি হয়ে যাবে। এই আধা পেশাদার পরিকাঠামোর মধ্যে যতটা করা সম্ভব তা করেছেন ক্লাব কর্তারা। যদিও গোয়ার দলগুলি আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইউ বি গ্রুপের সঙ্গে কথা বলে এসব পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও করে ফেলা যায়। তবে অন্য স্থানীয় দলগুলির তুলনায় ইস্টবেঙ্গল সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সাফল্য আসছে না। দলগঠনের সময়ে অনেক বিষয় মাথায় রাখতে হবে কর্তাদের। কোচ ট্রেভর জেমস মর্গ্যান পদত্যাগ করেছেন। টোলগে চলে গেছেন বিপক্ষ শিবিরে। ২০১২-১৩ মরশুমের সূচনাতেই বড় ধাক্কা এই দুটি ব্যাপার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তা ও মালিক ইউবি গ্রুপকে এটা মাথায় রাখতে হবে। জাতীয় ও এএফসি ঘুরে সাফল্য এলেও বাণিজ্যিক ভাবে লাভ হবে। দল বিদেশের ক্লাবগুলির মতো এক লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। বিপণন, বিনিয়োগ হাত ধরাধরি করে চলবে। খেলোয়াড়দের বাজারদরও বাড়বে বিদেশে। ভারতীয় ফুটবল প্রকারান্তরে সমৃদ্ধ হবে। বিদেশে একাধিক টুর্নামেন্ট খেলার আমন্ত্রণ আসবে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ যত ভাল হবে ততই ভারতীয় ফুটবলের মঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলকে ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। না হলে শুধু কলকাতা লিগ-শিল্ড নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, যা বিশ্বায়নের দুনিয়ায় কখনই কাম্য নয়।

শব্দরূপ-৬২৭ অনুপকুমার সিংহ

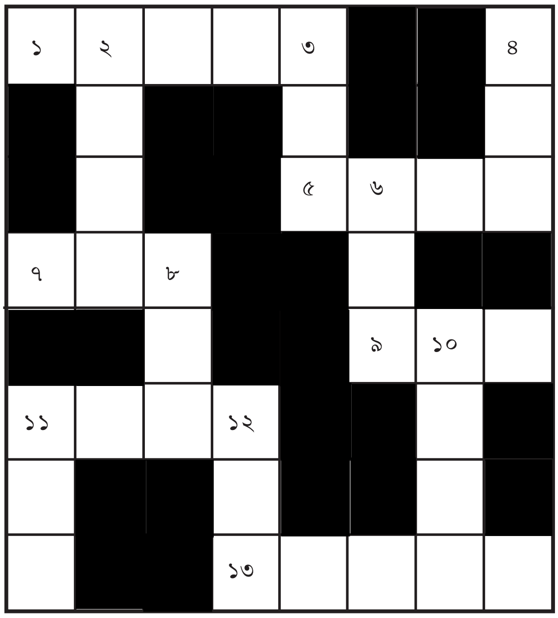

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কর্ণের ধনুক, ৫. লঙ্কাপুরীতে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থানস্বরূপ উপবন, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ইন্দ্রজিত এখানে যজ্ঞ করতেন, ৭. এঁর পুত্র সিন্ধু, সিন্ধুর বাবা ও মা দুজনে অন্ধ ছিলেন, ৯. বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রবীণা, ১১. সূর্য ও চাঁদের গ্রহণ, প্রাকৃতিক উৎপাত, শেষ দুয়ে ক্রোধ, ১৩. ইন্দ্রের আবাস বা গৃহ, একে-চারে মৃতদেহ, শেষ দুয়ে জঙ্গল।

উপর-নীচ : ২. মহাভারতের এক চরিত্র, ভীম তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করার ফলে মৃত্যু হয়, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব, ৩. প্রতিশব্দে রৌশন, প্রদীপ্তি, শেষ দুয়ে রাজার পত্নী, ৪. লক্ষ্মণের পত্নী, ৬. ধনের দেবতা, ৮. দুর্গের মধ্যে যুদ্ধ করার উঁচু জায়গা, ১০. পিতৃ পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম, ১১. শ্রীকৃষ্ণের এক সখা ও তাঁর খুবই ভক্ত, ১২. শিব ও পার্বতীর এই পুত্রের পূজা সকল কর্মের প্রারম্ভে করা হয়।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

দ	ধী	চি			উ	ত্ত	রা
		ক	র	ত	ল		ঘ
	সু		য়া				বা
	বা	ম	ণী			ই	রি
রা	হু			বা	তা	বি	
সে				সু		ষ্য	
শ্ব		ম	ন্দা	কি	নী		
র	ত	ন			ল	ক্ষ্ম	ণ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

▯ ৬২৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ জুন, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
“চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি”—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

“ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T.”

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ২৪

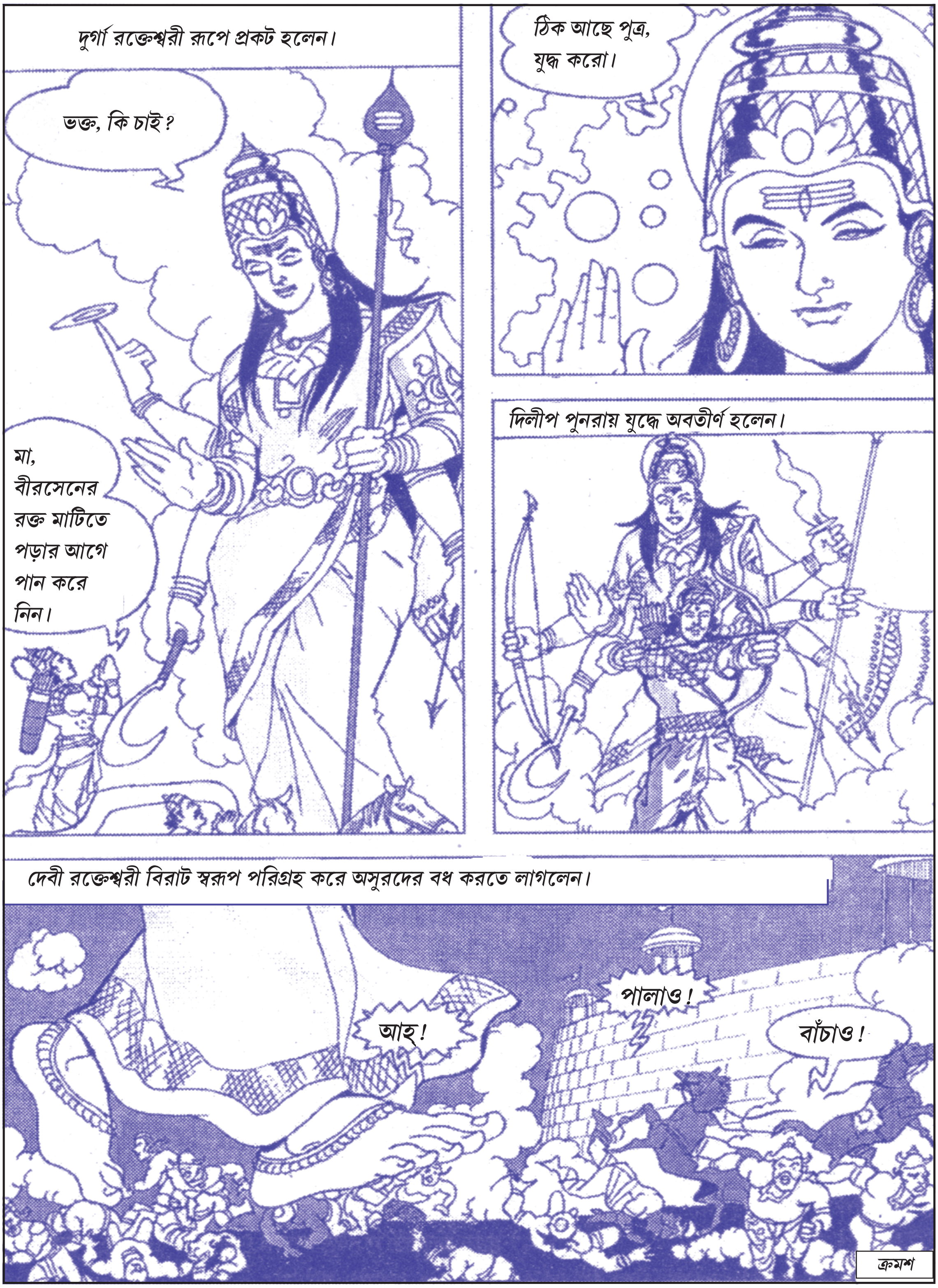

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

সংসদের ৬৫ বছরের ফোটোগ্রাফিক রেকর্ড ব্যক্তিগত হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজ পর্যন্ত যাঁরা লোকসভা ও রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছেন, কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাদের 'ফোটোগ্রাফিক রেকর্ড' অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু অনুমান করুন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই লুক্কায়িত মণিমাণিক্য কার হেফাজতে রয়েছে— দিল্লী কেন্দ্রিক একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্টুডিও-র হাতে।

প্রত্যেক লোকসভার মেয়াদ শেষে এবং প্রতি দু'বছর অন্তর রাজ্যসভা প্রার্থী নির্বাচনের পর ডাক পড়ে এ আর স্টুডিও-র। লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের ছবি তোলার জন্য। অন্য কোনও স্টুডিও-কে ডাকা যায় না কারণ এ আর স্টুডিও-ই দিল্লীর একমাত্র স্টুডিও যা একসঙ্গে ৫০০ মানুষের ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারে। ষাট বছর পরেও এই ধারা অব্যাহত। গত ১৩ মে ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে সংসদের প্রথম অধিবেশন। সংসদ-গ্রন্থাগারে দেশের প্রথম সাংসদদের ছবি দেখতে চেয়ে বহু অনুরোধ এসেছে। এ আর স্টুডিও শুধুমাত্র ফোটো তুলেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেনি। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সেই ফোটোর নেগেটিভগুলোকেও সযত্নে রেখে দিয়েছে। কপিরাইটসহ সংসদ গ্রন্থাগারেও এই সমস্ত দুর্লভ আলোকচিত্রমালার দুর্লভ একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। কিন্তু এগুলিকে বিক্রয় করবার কিংবা অন্য কাজে ব্যবহার করার কোনও অধিকার গ্রন্থাগারের নেই, সংসদের কিংবা সাংসদদের সরকারি প্রয়োজন ছাড়া।

গ্রন্থাগারের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের স্বীকারোক্তি— "আমরা এই ছবিগুলোর কপি দিতে পারি— যেমন রাষ্ট্রপতি সাংসদদের শপথ নেওয়াচ্ছেন কিংবা সাংসদেরা লোকসভায় প্রবেশ করছেন কিংবা ত্যাগ করছেন ইত্যাদি। কিন্তু কোনও গ্রুপ ছবি আমাদের দেওয়ার অধিকার নেই। কারণ একটি প্রাইভেট স্টুডিও-র হেফাজতে এর কপিরাইট রয়েছে।" সংসদ গ্রন্থাগারের সেক্রেটারি জেনারেল টি কে বিশ্বনাথন জানালেন, তিনি বিষয়টা খুব ভাল জানেন না। তাঁর বক্তব্য, "এ আর স্টুডিও দীর্ঘদিন যাবৎ এই কাজটা করে আসছে কারণ তাদের বিশেষ ক্যামেরা রয়েছে। কপিরাইটের ব্যাপারগুলো এরপর আমি দেখার চেষ্টা করবো।" এ আর স্টুডিও-র বর্তমান মালিক জি কে দত্ত জানালেন, "আমার ঠাকুর্দা এ আর দত্ত ছিলেন বৃটিশদের সরকারি আলোকচিত্রী। তাঁর নামেই স্টুডিও। তিনিই এক বৃটিশ আধিকারিকের কাছ থেকে কিনেছিলেন একটি 'প্যানোর‍্যামিক ক্যামেরা। সেই সময় দিল্লী শহরে তিনিই ছিলেন একমাত্র আলোকচিত্রী যাঁর নিজস্ব ক্যামেরায় ৫০০ জনেরও বেশি গ্রুপ ফোটো তোলা যেত।"

স্বাধীনতার পর এ আর দত্ত বারংবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে লোকসভার সদস্যদের গ্রুপ ফোটো নেওয়ার কথা বলেন। তারপর থেকে তিনিই এবং পরবর্তীতে তাঁর বংশধরেরা লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের গ্রুপ ফোটো নিয়ে আসছেন। কপিরাইটের বিষয়ে এ আর দত্তের সতর্ক মন্তব্য, 'আমাদের সঙ্গে কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি...কিন্তু যতদিন থেকে আমরা ছবি তুলছি তার সমস্ত নেগেটিভ আমাদের কাছে সযত্নে রেখে দিয়েছি। যদি অনুরোধ পাই আমরা কপিগুলি দিতে পারি।"

মধ্যপ্রদেশে তামাক নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মধ্যপ্রদেশ সরকার এবছরের ১ এপ্রিল থেকে তামাকজাত চর্ব্যপণ্য সারা রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিক্রি, বন্টন, উৎপাদন এং চর্বণও নিষিদ্ধ হয়েছে তামাকজাত পণ্যের। এই নিষিদ্ধকরণ সম্ভব হয়েছে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মানক কর্তৃপক্ষ আইন-এর (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) ২, ৩, ৪ নং ধারার উপর ভিত্তি করে। ওই আইন অনুসারে খাদ্যে নিকোটিন অথবা তামাকজাতীয় দ্রব্য মিশ্রণ নিষিদ্ধ। এই আইন বলবৎ হয়েছিল ১ আগস্ট, ২০১১ থেকে।

এর ফলে মধ্যপ্রদেশ হলো ভারতে সর্বপ্রথম রাজ্য যেখানে গুটখা'র উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছে। তবে অন্য একটি রাজ্যে 'গুটখা' নিষিদ্ধ—সেটি হলো গোয়া। গোয়াতে অবশ্য এজন্য রাজ্য জনস্বাস্থ্য আইনকে ভিত্তি করেই 'গুটখা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'গুটখা' নিষিদ্ধ করে মধ্যপ্রদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং যুবক-কিশোরদের গুটখা-র নেশা মুক্ত করতে কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। কেননা তরুণ-কিশোররা বেশি করে গুটখার মাধ্যমে তামাকে আসক্ত হচ্ছিল। নতুন প্রজন্মকে তামাকের নেশা ও অপরিণত বয়সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে বৃহত্তর জনস্বার্থে অসমেও একইরকমভাবে তামাক নিষিদ্ধ করা উচিত বলে জানিয়েছেন রাজ্যের ভলান্টারি হেলথ্ এসোসিয়েশন অফ অসম-এর কার্যকরী সম্পাদক রুচিরা নেয়োগ। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে গুটখার প্যাকেটের মধ্যে শতকরা সাত ভাগই ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট। এটা মাত্রায় অনেক বেশি। চোখ, আঙুল এবং পাকস্থলীতে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। সাধারণ লবণেও ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট থাকে, কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম। গুটখার মধ্য দিয়ে ওই মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট পেটে গেলে আলসার হতে পারে।

সাধারণ নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে তামাকজাত পণ্য নিষিদ্ধ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। ষোলটি আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্র থেকে পৃথকভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে গত বছরের এপ্রিল মাসেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, ধূমহীন তামাক খাওয়ার কারণে গলা থেকে মাথার মধ্যেকার অংশে ক্যান্সারের আধিক্য দেখা দিয়েছে। ওই ক্যান্সার সেন্টারগুলো হলো—মহারাষ্ট্রের মুম্বাই ও নাগপুর, রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং কেরল প্রদেশে।

ক্যান্সার আক্রান্তদের নিয়ে গঠিত হয়েছে—'ভয়েসেস অফ টোবাকো ভিকটিমস্'। তাঁরা একযোগে তামাকের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আরও কঠোর করার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন এবং দেশজুড়ে চিবিয়ে তামাক খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে বলছেন। ভি ও টি ভি-র আবেদনে সাড়া দিয়েছেন অসম সহ ১৩টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন সাংসদও। এখন দেখার, মানুষ আর কতদিন জেনে শুনে বিষপান করে।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
28 May - 2012

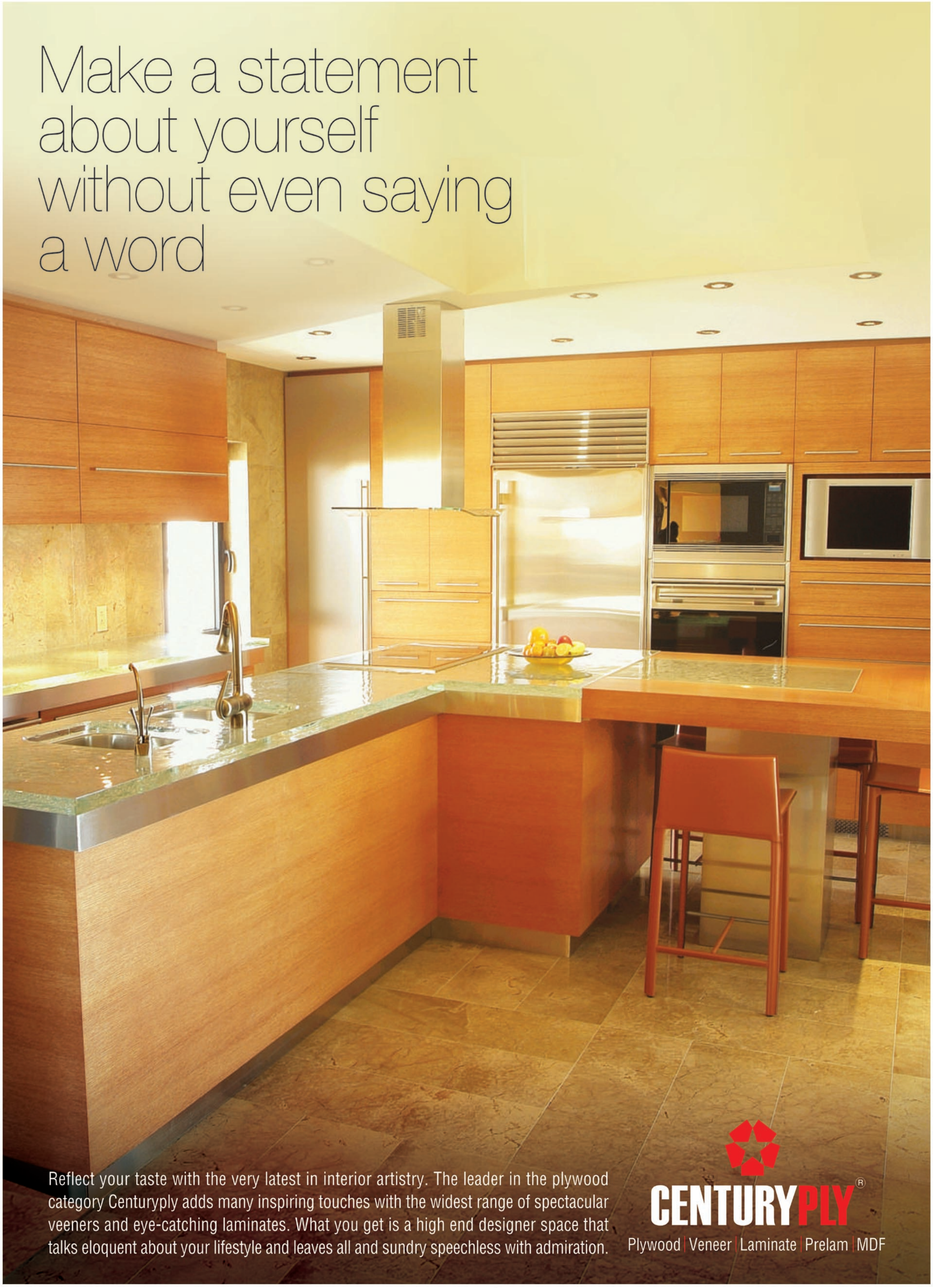

দাম : ৭.০০ টাকা